চার প্রহর

মাহমুদ আহমদ

৭ ওয়েস্ট রো : : কলিকাতা—১৭

কথা বলতে শিখেছি যার কাছে আর কথা
লিখতে শিখেছি যাঁর কাছে সেই পরম প্রিয়
শ্রদ্ধেয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে।

লেখকের অন্যান্য বই

হাম্ ওয়াহশী হ্যায় (মূল উর্দু থেকে অনুবাদ)

সকাল

ভোরের তারারা তখনো ডুবে যায়নি। কুয়াসায় হারিয়ে যাওয়া মিনার থেকে আজানের মূর্চ্ছনা জেগে উঠে স্টেট্‌স্‌ম্যান অফিসের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে চুবচুব হয়ে ঝরে পড়ে, "আস্‌সালাতো খায়রুম্‌ মিনান্‌ নওম"—নিদ্রার চেয়ে উপাসনা শ্রেয়।

উল-হাউসের বারান্দার নিচে ভিখিরিটার কোল ঘেঁষে শোয়া কুকুরটা উঠে সামনের পা দু'টো টানটান করে বিচিত্র ভঙ্গীতে আকাশের পানে মুখ তুলে চিৎকার ক'রে ওঠে অঁ-অঁ-অঁ।

মুয়াজ্জিমের গলার সঙ্গে গলা মেলাবার অদ্ভুত পশু প্রবৃত্তি।

হোটেলওয়ালা জব্বার মিয়া শুয়ে শুয়েই গালি পাড়ে, শালা হারামি কুত্তা।

আবদুল আড়ামোড়া ভাঙে বিছানায় প'ড়ে থেকে। এই সাত-সকালে শীতের দিনে বিছানা ছেড়ে উঠতে মন চায় না মোটেই, তবু উঠতে হবে। এখনই উনুন পরিষ্কার ক'রে আগুন ধরাতে হবে।

স্টেট্‌স্‌ম্যান'এর হকাররা সাইকেলের বেল বাজিয়ে কাগজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

লোক নেই জন নেই ফাঁকা পথ, গাড়িঘোড়ার হাঙ্গাম নেই, তবু একটার পর একটা হকার বেল বাজিয়ে বেরোয় অফিস থেকে— ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। সারি বেঁধে বেরোয় সাইকেলের দল। অকারণে কেন যে এই বাজনার ঘটা? রোজই একবার ক'রে মনে পড়ে আবদুলের, ওদের একদিন জিজ্ঞেস করতে হবে, আর রোজই ভুলে যায় কথাটা। শুয়ে শুয়ে শুনতে কিন্তু বেশ লাগে। শেষ সাইকেলটা বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত প'ড়ে প'ড়ে কান পেতে শোনে আবদুল, ছন্দময় বাজনার মিষ্টি সুর ক্রিং-ক্রিং ক্রিং-ক্রিং। আর একবার আড়ামোড়া ভেঙে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে আবদুল। দেরি হয়ে যাচ্ছে কাজের, এখনই আবার বকুনি দেবে জব্বার মিয়া।

ফলওয়ালা খাঁ সাহেব অত ভোরেই শীতে কাঁপতে কাঁপতে স্নান করেন মসজিদের কলতলায়। অশুচি শরীরে নামাজ শুদ্ধ নয়।

খড়মের শব্দ তুলে দাঁতন করতে করতে কলতলার দিকে এগিয়ে যায় জব্বার মিয়া।

নিত্য নূতন সকালের চিরপুরাতন দৈনন্দিন জীবনের পুনরাবৃত্তি।

এস্‌প্ল্যানেডের নেড়া গাছ ক'টায় একটা দু'টো কাক ডাকে। পূব আকাশ ফিকে হয়ে আসে একটু। উড়ে জলওয়ালা হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে জল ছিটোয় রাস্তায়। কুকুরটার গায়ে জলের ছিটে লাগায় ভিখিরিটার কাছ থেকে উঠে কাল্লুর গা ঘেঁষে শোয়। কাল্লু আরো একটু কুঁকড়ে যায়। গতরাত্রের রূপালী পর্দায় কাক্কুর কোমরের দোলা স্বপ্নের রেশে কম্পন জাগায়। কুকুরের উষ্ণ স্পর্শ রোমাঞ্চকর অনুভূতি আনে।

লাইনে জল ছিটোবার ট্রামটা ঢন্ ঢন্ ক'রে শব্দ তুলে চ'লে যায়। ঘুম ভেঙে যায় কাল্লুর। ধড়মড় করে উঠে বসে। কুকুরটা তখনো কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছে গরম আবেশে।

ঃ শালা হারামি কুত্তা—বিরক্তিভরে লাথি বসিয়ে দেয় কাল্লু কুকুরটার পেটে। ছিটকে পড়ে বেচারা ফুটপাথে।

ভোরের শান্ত বাতাস চিরে চিরে যায় বিদীর্ণ আর্ত চিৎকারে—কেঁউ···উঁ···উঁ।

মসজিদের কলতলা থেকে মুখহাত ধুয়ে হোটেলে এসে ওঠে কাল্লু।

জব্বার মিয়া তখনো হোটেল সাজিয়ে বসেনি। টেবিল চেয়ার-গুলো হলের কোণে জড়ো করা একটার পর একটা। আলো জ্বলছে হলে আর রান্নাঘরে মাত্র একটা ক'রে। খদ্দের কেউ আসেনি। এত ভোরে আসেওনা বড় একটা কেউ। আশপাশের বাড়ির দারওয়ান চাকর আর ছোটখাটো উটকো দোকানদাররা জব্বার মিয়ার সকাল বেলাকার খদ্দের। তাদের আসতে এখনও ঘণ্টা দু'য়েক দেরি। সন্ধ্যাবেলাকার সাজানো গোছানো আলোয় ঝলমলানো হোটেলের এখন হতশ্রী বিশৃঙ্খল রূপ। কেমন একটা চট্‌চটে গন্ধ উঠছে কুয়াসা আর রান্নাঘরের ভোরের দিককার রান্নার গন্ধ মিশে।

জব্বার মিয়া রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে হম্বিতম্বি শুরু ক'রে দিয়েছে, আবে নেহারিকা দেগ উধার রাখ।

ঃ সালাম আলায়কুম চাচা, টেবিলের ওপর থেকে একটা চেয়ার নামিয়ে নিয়ে গুছিয়ে বসে কাল্লু।

ঃ ক্যা বে কাল রাতকো কাঁহা থা? সালামের জবাব না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন করে জব্বার মিয়া।

ঠিক অভিভাবক না হ'লেও, অভিভাবকই বলা চলে জব্বার মিয়াকে। আজ আট বছর জুতো পালিশের সরঞ্জাম আর টিনের সুটকেশটা এই হেটেলেই জমা রেখে আসছে কাল্লু। নগদ মূল্যে দৈনন্দিন খাওয়াটাও সারে এখানে। সময় অসময়ে ধারধোরটাও দিয়ে থাকে জব্বার মিয়া।

শুধু কাল্লুই নয়; আরও পাঁচ সাতটা ছোকরা জুতো পালিশ-ওয়ালা আর ছোটখাটো দোকানদারের প্রতি কেমন যেন একটা টান আছে জব্বার মিয়ার।

খিটখিটে বুড়ো জব্বার মিয়ার মনের কোণে যে কোমল বেদনাটা এখনো লুকিয়ে আছে তা' মাঝে মাঝে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে এদের সঙ্গে ব্যবহারে।

কৈফিয়ৎ মেশানো সুরে উত্তর করে কাল্লু, কাল যারা চাচা লাস্ট-শো—

ঃ হাঁ হাঁ, শালা প্যয়সা জ্যাদা হো গিয়া—তিরিক্ষি মেজাজে ফেটে পড়ে জব্বার মিয়া।

কথার মাঝখানেই চুপসে যায় কাল্লু। সিনেমার কথাটা না বলাই উচিত ছিল। লাস্ট-শো'র কথা শুনলেই সবকিছু ওলোট্-পালোট্ হ'য়ে যায় জব্বার মিয়ার।

যুদ্ধের দিনের ঘটনা। জানা আছে সকলেরই তবু ভুলে যায় সকলে। ভোলেনা কেবল জব্বার মিয়া।

ভোলা কি যায় সহজে!

চোদ্দ বছরের আপন লায়েক ছেলে! তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর খাটবার গুণে অতো অল্প বয়সেই চৌকস্ হয়ে উঠেছিল হোটেলের কাজে। অদ্ভুত শখ ছিল তার সিনেমা দেখার, বিশেষ করে লাস্ট শো। সমস্ত দিন বাপের সঙ্গে হোটেলের কাজে আটকে থেকে লাস্ট-শো সিনেমা দেখতো ছেলেটা। সপ্তাহে দু'দিন অন্ততঃ দেখা চাই-ই। প্রথম প্রথম আপত্তি করত না জব্বার মিয়া। ছেলে বইতো নয়! আর শখও তার ওই একটাই। পরে কিন্তু আশঙ্কায় আপত্তি করতো প্রায়ই, চারো তরফ্ কারফু জারি হ্যায়, লাস্ট-শো' মত্ যারে।

ঃ কারফিউ হ্যায় তো ক্যা হ্যায়! হাম তো বারা বজেসে আগেই আজাহেঁ।

ঃ ফিরভি ক্যা ঠিক হ্যায়, আগার দের উর হো যায়?

ঃ বাঃ দের ক্যায়সে হোগা। হামকো মালুম নেই হ্যায়। বারা বাজেকে বাদ গোলি করেগা মিলিটারি।

বাদানুবাদে চ'টে ওঠে জব্বার মিয়া, নেই মালুম নেই হ্যায়। বাস্ হাম বোল রঁহে জানে নেই হোগা।

সেদিন আর সিনেমা যাওয়া হয় না সত্তারের। পরের দিন কিন্তু বাপকে না জানিয়েই লাষ্ট-শো সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরে সত্তার।

দেরি হয়েছিল কি হয়নি ঠিক জানা ছিল না সত্তারের। চমকে ওঠে বাপের চিৎকারে, ফির তে সিনেমা গিয়া থা?

আমতা আমতা করে সত্তার, যাবা···

ঃ যা-রা—ভেঙচে ওঠে জব্বার মিয়া।

ঃ শালা রোজ মানা করেঙ্গে আর ওই এক বাত—তেড়ে আসে জব্বার মিয়া ছেলের দিকে।

মেজাজ চড়ে যায় সত্তারের, গালি মত দো বোল রহেঁ।

ঃ গালি! শালা সরম নেই লাগে! মরেগা শালা কোন দিন গোলি খাকে।

ঃ সরমতো তুমকো লাগেগা, লড়কাকো গালি দেহো শালা বোলকে।

ঃ ক্যা! শালা যেতনা বড়া মু নেই ওতনা বড়া বাত?

ধৈর্যের বাঁধ ছিঁড়ে যায় জব্বার মিয়ার। ঠাস্ ক'রে একটা চড় বসিয়ে দেয় ছেলের গালে, শালা কালকা ছোকরা নিকাল ইহাসে।

ক্ষোভে দুঃখে আর লজ্জায় জল এসে যায় সত্তারের চোখে। থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে ওর সারা দেহ। প্রচণ্ড রাগে ঘুরে দাঁড়ায় সত্তার, নিকলেঙ্গে তো, কোন শালা আর তুমনা মু দেখে।

জব্বার মিয়া। অসহায়ভাবে কাল্লু তাকিয়ে থাকে ওর যাবার পানে। সত্তার একমাত্রই ছেলে ছিল জব্বারের।

হাসতে হাসতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে আবদুল, লো আব্‌ ভোরে ভোরে বুড্‌ঢাকা শির খারাব হো গিয়া।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকারে ফেটে পড়ে কাল্লু, তো তেরা ক্যা বে শালা?

চমকে ওঠে আবদুল। কাল্লুকে সামনে দেখে অবাক হয়ে যায় আবদুল, আরে তুম! তুম কাব আয়ে ওস্তাদ?

নিজেকে একটু সামলে নেয় কাল্লু, এই আভ্‌ভি আঁয়ে।

ভালো ক'রে কাল্লুর পানে তাকিয়ে দেখে আবদুল। হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে, ক্যায় বাত ওস্তাদ, ভোরে ভোর একদম পাতলুন পেহেনকে?

চোরাবাজার থেকে কেনা নীল রঙের কর্ড-এর প্যান্ট আর গোলাপ ফুল ছাপা সস্তা সিল্কের হাওয়াইয়ান সার্টটার পানে একবার গর্ব ভরে তাকিয়ে নেয় কাল্লু।

ঃ যা বে শালা তে লোগ সব শো গিয়া কাল রাত কো। হামকো এই পেহেনকে শোনে হুয়া।

ঃ তো তে ওতনা রাতকো কাহে আয়?

ঃ রাত! দেড় বাজেভি কোই রাত হ্যায়!

ঃ রাত নেই তো ক্যা?

ঃ আচ্ছা যা, চল্‌ চা পেলা তো?

আবদুল রান্নাঘরে চলে যায়। খদ্দেরদের জন্যে তখনো চা তৈরি হয়নি। নিজেদের তৈরি চা থেকে এক কাপ চা নিয়ে আসে আবদুল। টেবিলের উপর একটা হাতের ঠেকা রেখে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে কাল্লুর সঙ্গে, খেল ক্যায়সা থা ওস্তাদ?

ঃ মাত্‌ বোল বাপ, শালি কাক্কু ক্যা নাচে, শালিকা কমর···

আদি রসের আলাপটা বেশী দূর আর এগোতে পারে না। রান্নাঘরের ভেতর থেকে হাঁক দেয় জব্বার মিয়া, ক্যা বে কাম উম নেই হ্যায় ?

আদি রসের রেশ টেনেই বাঁ চোখটা বন্ধ করে চাপা গলায় একটা অশ্লীল মন্তব্য জব্বার মিয়ার প্রতি ছুঁড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে আবার রান্নাঘরের দিকে চলে যায় আবদুল।

কাল্লুও উঠে পড়ে। চা খাওয়া ওর হয়ে গেছে। হোটেল থেকে বেরোবার মুখে চোখাচোখি হয়ে যায় জরিনার সাথে। থমকে পড়ে কাল্লু।

অত ভোর বেলাতেই পঙ্গু স্বামীর জন্যে চা নিতে এসেছে জরিনা। চোখে চোখ পড়তেই অভ্যাস মত হাসি ফুটে ওঠে জরিনার মুখে। ঠোঁট দু'টো কঁচকে উঠেই কিন্তু থেমে যায় মাঝ পথে। লজ্জা পেয়ে চোখ দু'টো সরিয়ে নেয় কাল্লুর মুখের ওপর থেকে। গত রাত্রের কথা ওর মনে পড়ে গেছে। কাল রাত্রে কাল্লু ওকে দেখে ফেলেছে নিউ সিনেমার দাড়ি-ওয়ালা দারওয়ানটার ঘরে।

কিছু বলার জন্য একটু ইতস্ততঃ ক'রে কিছু না বলেই ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বেরিয়ে যায় কাল্লু।

কুয়াসা তখনো কাটেনি। আলো ফুটেছে অবশ্য আরো একটু। সবে মাত্র প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে শহরের জীবনে। এপারে এখনো ফলওয়ালারা দোকান সাজিয়ে বসেনি। ওপারে দোকান খুলেছে মাত্র একটা, 'ভুবনেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। সমস্ত রাত ট্রামের লাইনে কাজকরা কুলিদের কয়েকজন জটলা পাকাচ্ছে দোকানটার সম্মুখে বিরাট উনুনটার গা ঘেঁষে। প্রথম যাত্রীবাহী ট্রামটা দুলতে দুলতে

এসে দাঁড়ায় রঙের দোকানটার সামনে। সব ক'টা আলো জ্বলছে তার।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে কাল্লু। একটা বিড়ি বার ক'রে ধরিয়ে নেয় দেশলাই জ্বালিয়ে। গতরাত্রের কেনা বিড়ি কয়েকটা ভেঙে গেছে পকেটে। নিভন্ত কাঠি আর ভাঙা বিড়ির টুকরোগুলো ফেলে দেয় পথে। শীত শীত করছে একটু একটু। জোরে জোরে টান দিয়ে নাক মুখ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে আরাম বোধ করে কাল্লু। এগিয়ে যায় এস্প্ল্যানেডের দিকে। ইস্, জায়গাটার ভোল পাল্টে ফেলেছে ট্রাম কোম্পানী। কংক্রীট্, ট্রামলাইন আর তারে তারে ছেয়ে ফেলেছে সমস্ত অঞ্চলটা। কার্জন পার্ক গুটিয়ে গেছে অনেকখানি। তবু জায়গা আছে হাওয়া খাওয়ার। ভোর বেলার বায়ু-সেবীর দল বেরিয়ে পড়েছে মাঠে।

ধুতি, চাদর, প্যাণ্ট,স্কার্ট···

লাল, নীল, খয়েরি···

কুয়াসার আস্তরণ ভেদ ক'রে ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় এলো মেলো পুঞ্জ পুঞ্জ রঙের সচল গতি মন্দ লাগে না দেখতে।

প্যাণ্টের দুই পকেটে হাত পুরে উদ্দেশ্যহীন পা ফেলে কার্জন পার্কে ঢুকে পড়ে কাল্লু।

চেনবাঁধা একটা কুকুর নিয়ে আগে আগে হেঁটে চলেছে একটি বিদেশী মেয়ে। হাই-হিলের তালে তালে উঠছে নামছে ওর শরীরটা। হলদে রঙের স্কার্টের নিচে পেলব লম্বা পা দু'টো মোমের মত সাদা। পাশ থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে যায় ফুটফুটে দু'টি ছেলে মেয়ে। মুখগুলো ওদের গোলাপী আভা মাখানো। কুকুরটা ওদের দেখে আকুলি বিকুলি করে ছাড়া পাবার জন্যে।

শিশির ভেজা একটা বেঞ্চ রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে বসে পড়ে কাল্লু। দূরে আর একটা বেঞ্চে বসে মেমটা।

শরীরের বাঁধন দেখে এদের বয়স বোঝা অসম্ভব। তবু আন্দাজ করা যায়, খুব সম্ভব ওই ছেলেমেয়ে হু'টোর মা হবে। কুকুরটার মাথায় কয়েকটা আদরের চাপড় মেরে চেনটা খুলে নেয় গলা থেকে। তীর বেগে ছুটে গিয়ে ছেলেমেয়ে হু'টোর কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুকুরটা। শুরু হ'য়ে যায় ওদের ছুটোছুটি খেলা।

কুকুরের ডাক আর শিশুদের কলহাস্যে মুখরিত হয়ে ওঠে পার্কের পরিবেশ। আত্মতৃপ্ত সুখের ভাব ফুটে ওঠে মেয়েটির মুখে। বিদেশী হলেও মাতৃত্বের অনুরাগ বুঝতে পারে কাল্লু।

সন্তানের সুখকামনার প্রতিচ্ছবি সব মায়ের মুখেই এক।

বেখাপ্পা ভাবে কাল্লুর মনে পড়ে যায় জরিনার কথা। কাল রাত্রে অমন ভাবে ওর সঙ্গে দেখা না হলেই ভালো ছিল।

ক্লেদাক্ত অশ্লীল জীবনের বলি জরিনা। অসহায় জরিনা। বছর কয়েক আগেকার জরিনা আজ আর নেই। তবু সেদিনের কথা ভুলতে পারে না কাল্লু।

'ভাইয়া মেরা বাচ্চা!'

ঘুরে ফিরে মনে পড়ে যায় কথাটা। মা-ছেলের যে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে হাসি খুশি ছেলেমেয়েদের মুখ দেখে কিম্বা রূপালী পর্দায় মাতৃত্বের অভিনয় দেখেও মনে পড়ে যায় কথাটা।

আর তারই সঙ্গে মনে পড়ে যায় আর একটা কথা—অসহায় এক বালককে ছেড়ে চলে যাওয়া আর এক মায়ের কথা······

······ফুলহীন মা।

সদা হাস্যময়ী গোলগাল মুখ। ফর্সা রং। এক আঙ্গিনার পাঁচ বাড়ির কেউ কোনোদিন কাঁদতে দেখেনি ফুলহীন মাকে।

ভাবীর কাছে শোনা গল্প···

ফুলহীন-মা মা হয়নি তখনো, তবু তার চার পাশে সব সময়

জড়ো হয়ে আছে একগাদা ছেলেমেয়ে। আঙ্গিনার সবক'টা ছেলে-মেয়ের মনচুরি করেছে নয়ী তুলহীন।

মেহেদির রং, সুরমার কালি আর হাসির উচ্ছলতায় নয়ী তুলহীন আর পুরোনো হ'ল না কোনোদিন আঙ্গিনার কারুর কাছে।

সবক'টা ছেলেমেয়েদের নাওয়া খাওয়ার সব সময় হারিয়ে গেছে নয়ী তুলহীনের ছোট্ট ঘরটায়। ঘর ছোট্ট হ'লে কি হয়! হাজারো মজায় ঠাসা ওই ঘরের আবহাওয়া সব সময় গম্ গম্ করছে নতুন নতুন উত্তেজনায়। আজ সালমার মেয়ের বিয়ে, কাল সেলিমের ছেলের বিয়ে। ছেঁড়া রঙিন কাপড় দিয়ে সুন্দর সুন্দর পুতুল তৈরি করে নয়ী তুলহীন আর গান গাইতে পারে অদ্ভুত সুন্দর মিষ্টি গলায়। সারাটা তুপুর ধ'রে চলেছে তার তোড়জোড়। পুতুলের সাথে সাথে সাজানো গোছানো চলেছে পুতুল-কনের মাকে আর তার খেলার সাথীদের। সালমার ছোট্ট কপালে কাজলের টিপ দিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নয়ী তুলহীন, সালমা বিলকুল গুড়িয়া বন্ গয়ি।

সালমার মা এসে দাঁড়িয়েছে দোরগোড়ায়। অনেকক্ষণ মেয়েব খোঁজ না পাওয়ায় এসেছে তাকে নিতে। এখনও খাওয়া হয়নি সালমার।

ঃ বাস্ যাব্ দেখো তবহি ওই এক বাত! বোঁলে নয়ী তুলহীন তুমরা তো আর কোই কাম নেই হ্যায়।

কথা শুনে মুখ তুলে তাকায় নয়ী তুলহীন, সাচ্ বোলে আপা, দেখো সালমা কেতনি খুবসুরত্ হ্যায়।

গর্বে ফুলে ওঠে সালমার মা'র বুক। নিজের মেয়ে হলেও এমন ক'রে কোনো দিন সাজাতে পারেনি সে নিজে। অদ্ভুত হাত পেয়েছে নয়ী তুলহীন রূপ ফোটাবার।

মেয়ের হাত ধ'রে কাছে টেনে নেয় সালমার মা, চল খানা খায়গি। রসভরা হাসির ঢেউ রঙ দিয়ে যায় সালমার মা'র

বাঁকানো ঠোঁটের ভাঁজে ভাঁজে। যেতে যেতে মুখ ঘুরিয়ে বলে, হোগিরে হোগি, তেরি ইসসেভি খুবসুরত হোগি নয়ী তুলহীন।

ঃ ধ্যাৎ, এক ঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে নেয় নয়ী তুলহীন।

পুলক আর আনন্দের জোয়ারটাকে হাসির বাঁধে বাঁধতে গিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে ওঠে নয়ী তুলহীন।

কাল্লুর ছোট্ট বুকেও কাঁপন লেগেছিল একদিন! অজানা এক অফুরন্ত আনন্দের ছোঁয়া কাঁপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ওর ভাবনাবিহীন বুকটাকে কোনো এক রঙিন ভাবনার ভাবে। কতটুকুই বা বয়স তখন ওর……

তুলহীন মা বিয়ে দিতে চেয়েছিল কাল্লুর সাথে জরিনার……

…জরিনা!

দাগী চোর রহমতের বিবি জরিনা।

ভরা যৌবন, বড় বড় ভাসা ভাসা তুটো চোখ। পাঁচমাসের অন্তসত্ত্বা হওয়া সত্ত্বেও জামাদার খাঁ সাহেবের চোখে পড়ে যায় জরিনা। চোরেরসঙ্গী পুলিশ। খাঁ সাহেব অন্তরঙ্গতা বাড়িয়ে তোলে রহমতের সঙ্গে। জরিনা কিন্তু আমল দেয় না মোটেই। ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে জরিনা। খাঁ সাহেবও সুযোগ খোঁজে ভবিষ্যতের আর তার পিঠ পিছু দাঁতে দাঁত চেপে গালাগালি দেয় বস্তির লোকেরা, শালা কামিনা হ্যায়!

আগুন জ্বলে খাঁ সাহেবের রক্তে, আগুন ঝরে জরিনার তুই চোখে। পঙ্কিল আগুনে ছেয়ে যায় সারা দেশ। কোথায় যেন কি একটা ওলট-পালট হয়ে গেছে। হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান। রক্তমাখা উন্মত্ত দিন কাটে একটা পর একটা। সারা কোলকাতা,

সারা দেশ ডুবে গেছে খুনখারাপির নেশায়। বস্তিতেও এসে লেগেছে তার ঢেউ। তবু ডুবে যায়নি তারা কলঙ্কের বন্যায়, গরীব বলেই বোধ হয় তখনো জোট বেঁধে আছে এক সঙ্গে।

সুযোগ আসে খাঁ সাহেবের।

রাজনীতি আর প্রকৃতির আড়ালে রাতের অন্ধকারে সেপাই রামদিন আর গোবিন্দ পাঁড়ে এসে ডেকে নিয়ে যায় রহমতকে, থানায় হাজরি দিতে হবে। জোট বেঁধে থাকলেও অবিশ্বাসের কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে; রাত গড়ালে কেউ আর বড় একটা বাইরে বেরোয় না একলা।

রাত বারোটায় আসে খাঁ সাহেব। জমাদার দিন মহম্মদ খাঁ। দিশী মদের কয়েক ভাঁড় রঙিন নেশায় ভরপুর দিন মহম্মদ খাঁর উন্মত্ত কামনা তৃপ্তি খোঁজে জরিনার শান্ত দেহের আনাচে কানাচে। রাত ছুটোয় আসে রামদিন আর পাঁড়ে। খাঁ সাহেবের উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি চলে ক্ষুধার্ত পাগলা কুকুরেব।

জরিনাকে সব প্রথম দেখতে পায় পরমেশ্বরের মা। পরের দিন বেলা তখন দশটা।

বুড়ি এসেছিল পরমেশ্বরের ডান হাতের রূপোর বালাটা রহমতের কাছে বেচতে। দিন কয়েক আগে বেপাড়ায় গিয়ে হাতে একটা ছুরির ঘা খেয়ে এসেছিল পরমেশ্বর। হাসপাতালে যায়নি প্রথমে পুলিশের ভয়ে। শেষ পর্যন্ত হাতটা বিষিয়ে ওঠে কয়েকদিনের মধ্যেই। ভর্তি হ'তে হয় হাসপাতালে। হাঙ্গামা কম হয়নি। পুলিসের চোখ এড়াবার জন্যে ঘুষ দিতে হয়েছে ডাক্তারবাবুকে। কব্জির ওপর থেকে কেটে ফেলতে হয়েছে হাতটা। বাঁ হাতের বালাটা আর হাতে থাকতে পারেনা। তাই সেটা বিক্রি ক'রে যে কটা টাকা পেয়েছিল, বুড়ি তাই দিয়ে হাতে পায়ে ধরে ডাক্তারবাবুর মন ভিজিয়েছিল সেদিন। আর আজ এসেছিল ডান হাতের বালাটা বিক্রি

করতে। এম্পুট করা হাত, শূন্য হাত নিয়ে বাড়ি ফিরেছে আজ পরমেশ্বর।

বড়বাজারের জুম্মাপিরের দরগায় সিন্নি দেবে বুড়ি।

রক্তে থৈ-থৈ মেঝেয় অজ্ঞান জরিনাকে দেখে চিৎকার করে ওঠে বুড়ি। পাড়ার লোক জড়ো হতে দেরি হয়না মোটেই। ব্যাপারটা কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না প্রথমে ঠিক করে। পুলিসের হাঙ্গামে পড়ার ভয়ে কেউ কিছু করতেও সাহস করেনা। কাল্লুই সেদিন এগিয়ে এসেছিল বেপরোয়া ভাবে। তার কারণও আছে একটা। বুড়ি পরমেশ্বরের মার দান কিছু কম নেই ওর জীবনে। তাছাড়া রহমতের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল একটা। জুতা পালিসের সরঞ্জাম কেনার প্রথম টাকাটা দিয়েছিল রহমত। ফুটপাথে বসার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল সে। পুলিসের সঙ্গে রহমতের খাতির ছিল অনেকদিন আগে থেকে।

নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করেই জরিনাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় কাল্লু। পাক্কা সাত ঘণ্টা অজ্ঞান ছিল জরিনা। জ্ঞান হয়ে প্রথম যে কথা বলেছিল জরিনা সে কথা আজও ভুলতে পারেনি কাল্লু। ভুলতে পারেনা কেউ কোনদিন। ডাক্তারবাবু সাবধান করে দিয়েছিলেন আগেই; তবু কেঁদে ফেলেছিল কাল্লু জরিনার ডুকরে ওঠা প্রশ্ন শুনে, ভাইয়া মেরা বাচ্চা?

কোনো উত্তর সেদিন দিতে পারেনি কাল্লু। দেবার কিছু ছিলনা। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, জরিনা বোধহয় আর মা হবেনা কোনদিন। জরিনা আজও জানে না সে কথা। জরিনা যৌবনা। জরিনার স্বামী পঙ্গু। জরিনা মা হতে চায়...

ধ্যাত! আর ভালো লাগেনা ভাবতে। মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হাত তুলে জোরে জোরে বিড়িটায় টান দেয় কাল্লু।

বিড়িটা নিভে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। আলো ফুটেছে আরো একটু। পরিষ্কার হয়ে এসেছে চারিদিক। কুয়াসা প্রায় কেটে গেছে। লোক চলাচল বেড়ে গেছে পার্কে আর পথে। শীতের আমেজ ভালোই লাগছে, তবু ভালো লাগেনা। খাপছাড়া পুরোন কথাগুলো মনটাকে বিষিয়ে দিয়েছে অকারণে। বিরক্তিভরে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় কাল্লু। সামনে দূরের বেঞ্চটাও শূন্য। বিদেশী মেয়েটা তার ছেলেমেয়ে আর কুকুর নিয়ে চলে গেছে কোন এক ফাঁকে, কাল্লু তা টেরই পায়নি এতক্ষণ। পুরনো চিন্তার আমেজ কেটে আস্তে আস্তে বর্তমানের অনুভূতি ফিরে আসে কাল্লুর মনে। দূরে স্যার সুরেন্দ্রনাথের ষ্ট্যাচুর নিচে ভিড় জমে উঠেছে একটা। বিড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধীর পায়ে সেইদিকে এগিয়ে যায় কাল্লু।

রং-বেরঙের পোষাক পরা বায়ুসেবী বাবু আর পার্কের দারওয়ানদের ছোটখাটো একটা জটলা। ভিড় ঠেলে উকি মেরে দেখে চমকে ওঠে কাল্লু। মাথাটা ঘুরে যায় কিসের যেন একটা ধাক্কা খেয়ে। রক্তমাখা তুলো আর কাপড় জড়ানো মৃত এক নবজাতক। শীতে কুঁকড়ে যাওয়া মুষ্টিবদ্ধ একটা কচি হাত বেখাপ্পা ভাবে উঁচু হয়ে রয়েছে আকাশের পানে। রক্তশূন্য সাদা মুখ নীল হয়ে গেছে মৃত্যুর শীতল পরশে।

ছিটকে বেরিয়ে আসে কাল্লু ভিড়ের বাইরে। মন্তব্যের টুকরো কথাগুলো খোঁচা দেয় পিঠে আর কানের পর্দায়। সব কথা বুঝতে পারেনা কাল্লু। তবু শুনতে পায়—

ঃ কলিকাল!

ঃ ইয়াঙ্কিদের শিক্ষা।

ঃ দে শ্যুড্ বি শট্ টু ডেথ্...

ঃ এরা মানুষ!

ঃ হবে কোন বড় লোকেব কীর্তি।

ঃ ছেলেটা কিন্তু বেশ সুন্দব না?

হন্‌হন্‌ ক'রে এগিয়ে চলে কাল্লু। মাথাটা কেমন যেন ঝিম্‌ ঝিম্‌ করছে। শীতের হাওয়াতেও ঘেমে উঠছে হাত পা। গুলিয়ে যাচ্ছে সব কিছু। কুয়াসা ছিন্নভিন্ন ক'রে নূতন সূর্য উঠছে প্রথম ভোরেব। লাল হয়ে উঠেছে পূবের আকাশ। নবজীবনেব বার্তা বয়ে আনছে টকটকে লাল দিগন্ত। নীল আকাশের পটভূমিকায় লাল আলোর আভা, অপরূপ মোহনীয় নূতন দিন; আব রক্তাক্ত লাল কাপড়ের মাঝখানে নীল কঠিন মৃত্যু-শীতল নূতন মুখ। কোন হতভাগী মায়ের নবাগত সন্তান।

জরিনা মা হতে চায়······

হর্ণের তীব্র শব্দে সম্বিৎ ফিরে পায় কাল্লু। রেড রোডের ঠিক মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলেছিল নিজেব অজান্তে। হুড খোলা ক্যাডিলাকটা বেবিয়ে যায় প্রায় গা ঘেঁষে। মাড়োয়াড়ী গলায় গালাগালিটা ভাসতে থাকে বাতাসে—বুদ্ধু, কিনারসে যাও।

সম্বিৎ ফিবে পেয়ে স্থানুব মত দাঁড়িয়ে পড়ে কাল্লু। পকেট থেকে রুমালটা বার ক'বে ঘসে মুছে নেয় মুখটা। সাবা গায়ে ঘাম ঝরছে ওর। মাথায়, চুলে একবার হাত বুলিয়ে আকাশের পানে মুখ তুলে চায়। সূর্য উঠেছে অনেকটা ওপরে; দিন হয়ে গেছে। সমস্ত শরীরে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ফিরে তাকায় কাল্লু, ক্যাডিলাকটা তখনো দেখা যাচ্ছে দূরে।

ঃ শালেকা বাপ্‌কা রাস্তা হ্যায়—ফেটে পড়া বিতৃষ্ণায় মাটিতে পা ঠুকে ঘুরে দাঁড়ায় কাল্লু।

*　　　*　　　*

ঘাড় ঝুঁকিয়ে আনমনে কতক্ষণ কি যে ভেবে চলেছে জরিনা তার কোন ঠিক নেই।

ঃ আয় হায়!

চমকে উঠে মুখ তুলে তাকায় জরিনা।

হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়িয়ে রস-আমেজ কণ্ঠে কথা বলে আবদুল, আরে হায়! মুরদাকে লিয়ে এতনা দরদ! যারা ইধারভি তো কভি দেখো।

সিনেমা দেখে দেখে নাটকীয় ভঙ্গীতে কথা বলা প্রায় বারো আনাই রপ্ত হয়ে গেছে ওর। বুকে একটা হাত ঠেকিয়ে অদ্ভুত ছন্দে বেঁকে দাঁড়ায় আবদুল।

বাঁকা ঠোঁটে তলোয়ারের ধার এনে নিপুণ অস্ত্র ছোঁড়ে জরিনা, আরে যা যা, আয়নামে কভি মু্ দেখে?

আবদুলও কিছু কম যায় না কথায়—আরে মু্ ক্যা দেখেঙ্গে, জওয়ান হ্যায়! দিল দেখা, দিল?

ঃ আগ লগে তেরা জওয়ানি মে—করাতের ধারে কথা কেটে কেটে ঝরায় জরিনা।

খিল খিল করে হেসে ওঠে আবদুল, আর কাল্লু ওস্তাদকা—

তিড়বিড় করে জ্বলে ওঠে জরিনার অন্তরাত্মা। কিছুক্ষণ আগে কাল্লুর কথাই ভাবছিল মনে মনে···বড্ড বাড় বেড়ে গেছে আজকাল কাল্লুর; না না ওর কোনো দোষ নেই। নেইবা কেন? নিশ্চয় আছে, ও যদি চাইতো তাহ'লে কালকের অবস্থা কি আসতো কোনোদিন জরিনার! জরিনার জীবনের যত কথা কাল্লু জানে তত কথা আর কে জানে! তবে, তবে কেন ও এরকম করে! বেশ করেছে, জরিনা যা করেছে। ভালোই করেছে, না ক'রে ওর উপায় কি, ও যে···মনের সঙ্গোপনে লালিত চিরন্তন কামনার রঙিন অনুভূতিটা পাখা মেলে দেয় আশার অনন্ত আকাশে। এবার নিশ্চয়

ও…অনাগত সুখতৃপ্তিতে আধ-বোজা হয়ে আসে চোখ দুটো…কিন্তু কাল্লু।

কাল্লুর নাম শুনেই তিড়বিড় করে জ্বলে ওঠে জরিনা, কাল্লু ও-স্তা-দ!

কপালের ওপর এসে পড়া চূর্ণ চুলগুলোকে এক ঝটকায় পেছনে সরিয়ে দিয়ে আবদুলের মুখের সামনে হাত নেড়ে অশ্লীল একটা গালাগালি দিয়ে তেড়ে আসে জরিনা, কাল্লু ওস্তাদ ক্যারে কামিনা?

এক পা পিছিয়ে যায় আবদুল।

হঠাৎ কেন যে ক্ষেপে গেল জরিনা, অবাক হয়ে তাই ভাবে আবদুল। ওর কথার যে একটা উত্তর দিতে হবে তাও বেমালুম ভুলে যায়। এর আগে বহুবারই কাল্লুর ঠেস দিয়ে রসিকতা করেছে ও জরিনার সাথে কিন্তু কোনো দিনই এরকম ঘটেনি। শালার আজ দিনটাই খারাপ শুরু হয়েছে। তখন কাল্লুও হঠাৎ চটে গিয়েছিল আর এখন জরিনাও চটে গেল।

একটু আনমনা হয়ে পড়ে আবদুল। হঠাৎ খেয়াল হয়, তাইতো, কাল্লু তো কিছুক্ষণ আগে এখানেই ছিল, সেই নিশ্চয় চটিয়ে দিয়ে গেছে জরিনাকে।

তাড়াতাড়ি মুখ তোলে আবদুল। দেখে জরিনা ফিরে যাচ্ছে নিজের মনে কি বকতে বকতে। জরিনা যে এভাবে ফিরে যাবে আবদুল তা ঠিক চায়নি। সামান্য একটু রসিকতা করতে চেয়েছিল মাত্র। পঙ্গু স্বামীর জন্যে রোজই চা নিতে আসে জরিনা আর রোজই দু' একটা রসিকতা করে আবদুল। জরিনার কাটা কাটা কথাগুলো মিষ্টি কম নয়!

জরিনাকে ফিরে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি ডাক দেয় আবদুল, আরে শুনো শুনো, ও জরিনা—

নাম ধরে জরিনাকে বড় একটা কোনোদিন ডাকেনি আবদুল।

আজ হঠাৎই নামটা এসে পড়ে মুখে। ভোরের নিরিবিলি শান্ত কুহেলী আবহাওয়ায় নিজের কানেই কেমন যেন শোনায় নামটা। রোমাঞ্চকর এক আচমকা শিরশিরে অনুভূতি কাঁপিয়ে দিয়ে যায় ওর সমস্ত শরীরটা।

থমকে ফিরে দাঁড়ায় জরিনা। এ রকম গলায় এর আগে আর কোনো দিনই ও ডাকতে শোনেনি আবদুলকে। অবাক হয়ে ও দূর থেকে তাকায় আবদুলের মুখের পানে।

আর একবার ডাকা প্রয়োজন বুঝেও গলা থেকে আর কোনো শব্দ বার করতে পারে না আবদুল। নিজের মনেই কেমন যেন শঙ্কিত হয়ে ওঠে বেচারা। জরিনার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মাটির পানে মুখ নামিয়ে হোটেলের দোরগোড়ায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে আবদুল।

ধীর শান্ত পদক্ষেপে ফিরে আসে জরিনা। একটু আগের জরিনা আর এখনকার জরিনার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

আস্তে আস্তে মুখ তোলে আবদুল।

মুহূর্ত, মুহূর্ত মাত্র ওর চোখের পানে তাকায় জরিনা। না, ভুল সে বোঝেনি, ভুল করেছে আবদুল। পুরনো সহজ সরল হাসির কুঞ্চন জাগে জরিনার ঠোঁটে, ক্যা? ক্যা হ্যায়রে?

আবদুলের অনুতপ্ত কণ্ঠে স্বর ফোটে একটু একটু, চা, চা নেই লোগি?

ঃ চা-ই তো লেনে আয়ে থে, তুম খামাকা…

ঃ হাম ক্যা কিয়া?

ঃ তুমহি তো……

ঃ আচ্ছা বাস্ বাস্, ফির গুস্সা নেই—নাটকীয় ভঙ্গীতে তড়বড় করে কথা বলে আবদুল।

জরিনা হেসে ফেলে ওর কথার ঢং দেখে।

ঃ এক মিনিট—এক ঝটকায় জরিনার হাত থেকে চা

নেবার খালি টিনটা ছিনিয়ে নিয়ে তিন লাফে ওপরে উঠে যায় আবদুল।

খদ্দেবদের চায়ের কেটলি সবে ফুটতে শুরু করেছে উনুনের ওপর। চা বানাবার জন্য কেটলিতে হাত দিতেই ওদিক থেকে হাঁক ছাড়ে হেড বাবুর্চি খলিল মিয়া, ক্যা বে আভিভো চায় পিয়ে, ফিব কাহে?

ঃ মেরা নেই ওস্তাদ, খরিদার হ্যায় খরিদার—খুশি মনে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে ভালো ক'রে দুধ চিনি মিশিয়ে মনের মতো ক'রে চা তৈরি করে আবদুল। জরিনাকে আজ একটু খুশি করে দেওয়া দরকার।

চা-সুদ্ধ গরম টিনটা রুমাল দিয়ে ধ'রে নিয়ে ফিরে আসে আবদুল, লো পিকে দেখো ক্যায়সা চায় বানা হ্যায়!

ঃ কোন বানায়া, তুম? চা'র পানে তাকিয়ে খুশি হয়ে ওঠে জরিনা।

ঃ আর নেই তো ক্যা! শালা খলিল বানায়গা এয়সা চায়!

ঃ আরে বড়া কারিগর বন গিয়া—আবার হাসে জরিনা। আঁচলের খুঁট খুলে পয়সা বের করে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে খপ্ ক'রে ওর হাতটা ধ'রে ফেলে আবদুল—নেই, আজ প্যায়সা মত্ দো।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয় জরিনা, কাহে?

অসহায় মিনতি ঝরে আবদুলের চোখে, এয়সি।

মমতার ছোঁয়া লাগে জরিনার মনে, তো ক্যা প্যায়সা তুম দোগে?

ঃ হুঁ—চোখ নামিয়ে নেয় আবদুল।

এবার অদ্ভুত হাসি হাসে জরিনা, ঠিক হ্যায়,—গরম চায়ের টিনটা আঁচল দিয়ে ভালো ক'রে ধরে এগিয়ে যায় জরিনা।

খুশির জোয়ার লেগেছে আবদুলের মনে।

ঃ আয় ছায়—তিনলাফে ভেতরে ঢুকে টেবিলের ওপর থেকে চেয়ারগুলো নামিয়ে নিয়ে তড়বড় ক'রে হোটেল সাজাতে শুরু ক'রে দেয় আবছুল।

এল্ মল্লিকের পেছন দিকে স্টেট্‌স্‌ম্যান'এর গা ঘেঁষে পূবমুখো যে পথটা ম্যাডান ষ্ট্রীটে গিয়ে পড়েছে, তারি দক্ষিণ ফুটপাথে পাঁচ-তলা যে বাড়িটা অসমাপ্ত পড়ে আছে আজ কয়েক বছর, তারি এক তলার একটা অংশে সপরিবারে স্থান পেয়েছে রহমত আজ বছর দেড়েক হ'ল।

শীত বর্ষা আর প্রাকৃতিক ছুর্যোগ থেকে নিখরচায় রক্ষা পাবার এমন একটা সুন্দর আস্তানা জুটে যাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা বলতে হবে। হ্যাঁ সৌভাগ্য বৈকি। এ রকম একটা আস্তানার জন্যে মাসে মাসে মাত্র চার টাকা দারওয়ানকে দেওয়া আজকালকার বাজারে কোনো খরচাই নয়। বিশেষ ক'রে ভাঙ্গা কোমরের বেদনা নিয়ে শীত আর বর্ষায় যদি পড়ে থাকতে হ'ত ফুটপাথে, তা হ'লে বোধ হয় শেষই হয়ে যেতো রহমত।

—শোকর লাক শোকর খোদার দরবারে। এমন একটা আস্তানা জুটিয়ে দিয়েছেন ভাগ্যে। একলা থাকলে হয়তো জুটতো না ভাগ্যে এরকম একটা ডেরা; ভাগ্যিস জরিনা আছে সঙ্গে। অবশ্য দারওয়ানটারও মায়া মমতা আছে মনে। প্রথম দিনই জরিনার পানে তাকিয়ে হেসে হেসে বলেছিল, —তুম রহেগি ?

রহমত কথা বলার আগেই ঘাড় বাঁকিয়ে হেসে উত্তর দিয়েছিল জরিনা, হাঁ আর মেরা আদমি।

এতক্ষণে রহমতের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখে দারওয়ানজী, আরে ইতো চলনে নেই সকে!

ঃ হাঁ ভাইয়া তবহি তো……

—জরিনার কথা শেষ হবার আগেই উদার হয়ে ওঠে দারওয়ানজীর কণ্ঠ,আচ্ছা, ঠিক হ্যায়, রহো।

জরিনা আর রহমত তু'জনাই বর্তে যায় থাকার অনুমতি পেয়ে।

ঃ মগর হাঁ এক বাত—চন্দনের তিলক কাটা কপালে কুঞ্চনের রেখা ফুটিয়ে সাবধান বানী উচ্চারণ করে পশ্চিমী ব্রাহ্মণ দারওয়ানজী—কোই অনাচার নেই হোয়।

রাগ আর ক্ষোভের আগুন ঝিলিক দিয়ে ওঠে রহমতের চোখে।

আশঙ্কায় শিউরে ওঠে জরিনা—এই রে রহমত বুঝি সব ভণ্ডুল ক'রে দেয়, খামখা হাত ছাড়া হয়ে যাবে এমন সুন্দর ডেরাটা। তাড়াতাড়ি রহমতকে আড়াল ক'রে এগিয়ে এসে কথা বলে জরিনা, —তোবা তোবা, ক্যা বোলো ভাইয়া!

দারওয়ানজী কিন্তু কোনো খেয়ালই করেনা ওর কথার। একটানা ব'লে চলে নিজের ছন্দে, আর হাঁ, মালিক আনেসে খালি কর দেনে হোগা জাগা কুছ দেরকে লিয়ে। উস বকত হাম জারা গরম গরম বাতভি বোলে গেঁ, আউর,……তু'পা এগিয়ে এসে জরিনার প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে আসে দারওয়ানজী—মাহিনামে চার রুপিয়া কেরায়া লাগে গা।

ঃ চার রু-পি-য়া! রহমত আরো কি যেন বলতে যায়।

ঃ হাঁ দো আদমি চার রুপিয়া, উস্‌মে কোই কম নেই হোগা, হাঁ—রহমতের কথার মাঝখানেই শেষ হুকুম জারি ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়ায় দারওয়ানজী।

অগত্যা চার টাকাই ঠিক হয়ে যায়। রাস্তার ধারে পাকাপোক্ত পাঁচতলা বাড়ির একতলায় অস্থায়ী ডেরা, মাসিক খরচ চার টাকা।

সেদিন একটু বেশী মনে হলেও আজ নিখরচাই মনে হয় এমন একটা সুন্দর ডেরার মাসিক ভাড়া চার টাকা। শোকর, লাক শোকর খোদার দরবারে! আর বাহাদুরি আছে জরিনার।

রোজ সকালে ঘুম ভাঙ্গলে একবার ক'রে ডেরার কথাটা মনে পড়ে রহমতের, আর আরামে রাত কাটাবার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানায় খোদার দরবারে। আজ আরো বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে কথাটা কারণ কাল রাতে আবার একবার তাগাদা ক'রে গেছে দারওয়ানজী। এ মাসের ভাড়াটা এখনো বাকি। জরিনাকে এখনো বলা হয়নি কথাটা। কাল রাতে জরিনা যখন ফিরেছিল তার অনেক আগেই বিছানায় ঢলে পড়েছিল রহমত ঘুমে আর নেশার মৌজে।

নেশার কথা মনে পড়তে হাসি পায় রহমতের। নেশা আর করে কই রহমত! পয়সা কোথায় নেশা করার। করতো বটে এক কালে। এখন তো খায় আফিম, তাও আবার দিনে রাতে মাত্র তিনবার। সকাল, সন্ধ্যো, রাত।

তাই তো জরিনা গেল কোথায়! এখনো ফিরলো না চা নিয়ে। মুখের ওপর থেকে কাঁথা সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসে রহমত।

এল্লোত যায় ধুলে আর অভ্যেস যায় ম'লে। ভ্যালা এক অভ্যেস হয়েছে আজকাল। ঘুম থেকে উঠে আফিম আর চা না খেলে প্রাতঃকৃত্য সারা হবে না। আড়ামোড়া ভেঙ্গে হাই তুলে জরিনার পথ চেয়ে উসখুস করে রহমত।

গরম চায়ের টিনটা আঁচল দিয়ে ভালো ক'রে ধ'রে সাবধানে পা ফেলে ফেলে ঘরে এসে ওঠে জরিনা, ক্যা নিদ টুটা? চায়ের টিনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে আলগোছে কথা ক'টা ছুঁড়ে দেয় রহমতের দিকে।

ঃ নিদ তো কভিকা টুটা, তুম যব বাহার গয়ি—ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুম ঘুম গলায় উত্তর দিয়ে জরিনার দিকে তাকিয়ে থাকে রহমত।

দেওয়ালের ধার থেকে হাতল ভাঙ্গা চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে রহমতের কাছে এসে বসে জরিনা। টিন থেকে খানিকটা গরম চা

ঢেলে নেড়েচেড়ে পেয়ালাটা ধুয়ে পুরো এক কাপ চা ঢেলে এগিয়ে দেয় স্বামীর দিকে, লো পিও।

হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা নিয়ে মিষ্টি সুরে প্রশ্ন করে রহমত, এতনা দের হুয়া ?

ঃ দের কাঁহা! দোকান খুলেগা, চায় বনেগা, তবতো—একটু যেন কুণ্ঠিত কণ্ঠে উত্তর দেয় জরিনা।

বিছানার তলা থেকে আফিমের কৌটোটা বার ক'রে একটা গুলি মুখে ফেলে কয়েক ঢোঁক গরম চা খেয়ে মুখ চাটে রহমত আর আনমনে চুপচাপ বসে চা খায় জরিনা।

গতরাত্রের ঘটনার পর থেকে কেমন যেন মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে জরিনা, স্বামীর পানে ভালো ক'রে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

আর রহমত মনে মনে ভাবে কেমন ক'রে কথাটা পাড়বে জরিনার কাছে। কাল রাত্রে দারওয়ানজী বড় কড়া ক'রে বলে গেছে টাকার কথাটা।

আলোর ডোরাকাটা সুন্দর শীতল হিমেলী ভোরটা যখন মৌজ আমেজ হয়ে উঠেছে চায়ে আর নেশায় তখন টাকার কথা তুলে সেটাকে ভেঙ্গে দিতে মন চায় না রহমতের। টাকার কথা বললেই এখনই খিঁচিয়ে উঠবে জরিনা ; অথচ কথাটা বলতেই হবে জরিনাকে। সমস্ত দিনের চেষ্টায় আজ যদি টাকাটা না দেওয়া যায় তাহলে রাত্রি বেলা হয়তো বারই ক'রে দেবে দারওয়ানজী এই ডেরা থেকে। মনে মনে শিউরে ওঠে রহমত। এই শীতে একদিনও বাইরে থাকা সম্ভব নয় ওর পক্ষে।

গলা খাঁকারি দিয়ে কথা বলার উদ্যোগ করে রহমত, এই শুনো—

চমকে ওঠে জরিনা, এ্যাঁ!—

চা'টা সত্যি ভাল বানিয়ে ছিল আবদুল। চা খেতে খেতে

অন্য কথায় মন চলে গিয়েছিল জরিনার……আবদুলও যে ওকে… কথাটা কয়েক দিন আগে বললো না কেন আবদুল !

টাকার কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারে না রহমত। নিজেকে আজকাল বড্ড বেশী অসহায় মনে হয় রহমতের, জরিনার কাছে। আগে যাও দু'চার পয়সা রোজগার হ'ত, পঙ্গু দেখে লোকে একটু দয়া ক'রত আজকাল তাও হয় না, সারা দিনে মেরেকেটে বড়জোর বারোআনা চোদ্দআনা। জরিনার আয়ই জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন। তাছাড়া জরিনার চালচলনও আজকাল যেন কেমন কেমন।

ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে রহমত—মানে, শুনো—

এতক্ষণে পূর্ণ চোখ মেলে স্বামীর মুখের পানে তাকায় জরিনা ক্যা ?

খপ ক'রে জরিনার একটা হাত ধ'রে ফেলে রহমত, কাল রাত……

থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে জরিনার সমস্ত শরীরটা ; তাড়াতাড়ি কথা বলে স্বামীর কথা কেটে—যারা দের হো গিয়া থা। সাহেব লোগকা হোটেলমে কাল পার্টি থা, উহিপর বহুত দের তক সব বাবু লোগ থা।

ব্যস্ত হয়ে আঁচল খুলে খুচরো টাকা পয়সায় প্রায় আড়াই টাকার মতো দেখায় হাতে ক'রে, দেখো না, কাল কেতনা মিলা।

কথাটা অনেকখানি সত্যিও বটে। গত সন্ধ্যায় টেম্পল বারে এক দল মাতাল পাঞ্জাবী যুবক অনেকক্ষণ ধরে হৈ-হুল্লোড় করেছে ; তাদেরই একজন মনের খেয়ালে দু'টাকা দান করে গেছে জরিনাকে।

ঃ নেই নেই উ বাত নেই—টাকা দেখে দুশ্চিন্তার ভারী বোঝাটা নেমে যায় রহমতের বুকের ওপর থেকে।

সোহাগভরে হাত বাড়িয়ে বৌকে বুকের কাছে টেনে নেয় রহমত, দের কা বাত নেই ; কাল দারওয়ানজী আয়া থা

ভাড়াকে লিয়ে, আজ রূপিয়া নেই দেনেসে নিকাল দেগা বোলা হ্যায়।

স্বামীর বুকের সঙ্গে মিশে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জরিনা, বড়া আয়া নিকাল দেনেওয়ালা। হামলোগ আজই দে দেঙ্গে উসকো রূপিয়া।

বউয়ের মাথাটা আরো জোরে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধ'রে খুশি মনে আকাশের পানে মুখ তুলে তাকায় রহমত।

কুয়াশার ঝরকা দিয়ে তীর্যক আলোর রেখাগুলো এসে পড়েছে তেকোণা পার্কটার গাছের ডালে, ঘাসের ডগায় আর ওদের এই অসমাপ্ত বাড়িটার মরচে পড়া লোহার ফ্রেমের গায়ে গায়ে।

দিন শুরু হয়ে গেছে।

আর একটা দিন……

ঘণ্টা দুয়েক আগেকার নিরীহ পথঘাট মুখরিত হয়ে উঠেছে কর্ম-চঞ্চল ব্যস্ততায়। ট্রাম বাস আর লোক চলাচলে ভরে উঠেছে এস্‌প্ল্যানেড ধর্মতলা। দোকানপাট খুলে গেছে অনেকগুলো। উর্ধ্বমুখে ছুটে চলেছে কর্মী মানুষের দল। মোড়ের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে কাগজ বিক্রি করছে বিভিন্ন কাগজের হকাররা। কয়েকটা ফেরিওয়ালা এরই মধ্যে দোকান সাজিয়ে ফেলেছে ফুটপাথে।

দূর থেকে পরমেশ্বরকে দেখতে পেয়ে রক্ত উঠে যায় কাল্লুর মাথায়। হতভাগা দিব্যি আরামে বসে আছে ওর জায়গায়। মসজিদের সরু রাস্তাটা যেখানে এসে মিশেছে ধর্মতলায় ঠিক সেই কোণের গাছতলাটা কাল্লুর জায়গা। ওখান থেকে দুই পথের যাত্রীদেরই ধরা যায়।

কাছে এসে প্রচণ্ড রাগে লাথি বসিয়ে দেয় কাল্লু পরমেশ্বরের জুতা পালিসের বাক্সটায়—শালা বাপ কা জাগা পায়া,না?

শিউরে ওঠে পরমেশ্বর। সে ভেবেছিল পুলিশ। সামনে কাল্লুকে দেখে কেমন যেন হক্‌চকিয়ে যায় বেচারা, পরক্ষণে আক্রোশে আর হতাশায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে, শালা সব ফেক দিয়া!

ছুটে আসে করিম, জান্নু, বীরবল।

ঃ ক্যায় হুয়া, আরে হুয়া ক্যা?

ঃ হোগা ক্যা! শালা কাল্লুকা ফুটানি।

ঃ ঠিক হ্যায়, শালা বায়ঠিস কাহে উসকা জাগা মে।

ঃ ব্যায়েঠেগা বোলকে ফেক দেগা!

ঃ দেখোনা শালা সব তোড় দিস।

ঃ যানে দো, আরে যানে দো!

ঃ যানে দো ক্যা! ই ঠিক বাত নেই হ্যায়।

চিৎকার আর গালাগালির হট্টগোলে জোট পাকিয়ে ওঠে দুটো পক্ষ। কাল্লুকে ভয় করে আর ভালোবাসে সকলেই, তবু এ অনাচার সহ্য করতে চায়না কেউই। কাল্লুর পক্ষের লোকগুলোও কেমন যেন গুলিয়ে ফেলে তাদের কথাগুলো।

ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে অধিকারের প্রশ্নে।

কাল্লু শুধু বলে, সব শালাকো তোড় দেঙ্গে, শালা লোগ সামঝা ক্যা হ্যায়।

আর হতাশায় কেঁদে ফেলে পরমেশ্বর—শালা সব ফেক দিয়া!

মিটমাট হতে কিন্তু বেশীক্ষণ লাগেনা। বুড়ো এরসাদ মিয়া পরমেশ্বরের বাক্সটা গুছিয়ে তুলে দেয়। বীরবল টেনে নিয়ে যায় কাল্লুকে হোটেলের দিকে। যে যার নিজের জায়গায় বাক্স সাজিয়ে বসে পড়ে। জান্নু জায়গা করে দেয় পরমেশ্বরকে নিজের পাশে কাল্লুর ঠিক বিপরীত দিকে। লাল কালির শিশিটা ভেঙে গিয়েছিল।

কাঁচের টুকরোগুলো একটা একটা করে কুড়িয়ে কিনারায় সরিয়ে দেয় বুড়ো এরসাদ। অনেকটা জায়গা লাল হয়ে গেছে কালির রঙে।

কাটা হাত দিয়ে চোখ মুছে আর একবার কেঁদে ওঠে পরমেশ্বর—শালা সব ফেক দিয়া!

কিছুক্ষণ পরেই নিজের সাজ সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে আসে কাল্লু। দু'দিন আগে কেনা কোবরা-ব্রাউন-এর শিশিটা বাক্স থেকে তুলে নিয়ে বাড়িয়ে দেয় পরমেশ্বরের দিকে, লে বে তেরা পালিশ লে।

ওদিক থেকে চুটকি কাটে জমির, শালা দরদ দেখায়ে!

ঃ খবরদার শালা—ঝাঁঝিয়ে ওঠে কাল্লু।

খনখনে গলায় চিৎকার করে বুড়ো এরসাদ, শালালোগ ঝগড়া করেগা খালি, য়া কামায়গা ভি।

চুপ করে যায় সকলে। নিজের জায়গায় বাক্স সাজিয়ে বসে পড়ে কাল্লু।

লোক চলাচলে ভরে উঠেছে ফুটপাথ। শুরু হয়ে যায় রোজগারের প্রতিযোগিতার চিৎকার—

ঃ হোয়াইট্, হোয়াইট্ হোগা সাব।

ঃ পালিশ পালিশ।

ঃ ব্রাউন, কোবরা ব্রাউন।

খদ্দের জুটে যায় জান্নু আর পরমেশ্বরের। কাটা হাতটায় অপূর্ব দক্ষতায় কাপড় জড়িয়ে পালিশ করে পরমেশ্বর। টাটকা কোবরা ব্রাউন পালিশ; চকচক করে জুতোর মুখ আর চক্চক্ করে পরমেশ্বরের চোখ দুটো।

দিন বাড়ে।

এপয়েন্টমেন্ট এগ্রিমেন্ট আর দেনা পাওনার দিন।

যানবাহনের গতিবেগ আর মানুষের পদক্ষেপে দিন বাড়ে শহরের আর সূর্য ওঠে ওপরে। সবকটা দোকান খুলে গেছে। যাত্রীর ব্যস্ততা আর বিকিকিনির হৈ-হুল্লোড়ে ভবে উঠেছে পথের বুক, ফুটপাথের কোল।

আজ শনিবার।

জমজমাট হয়ে ভরে উঠবে শহরের পথঘাট দু'টোর পর থেকে। বিকেল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে রূপ পাল্টাবে শহরের দিন। বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর হয়ে উঠবে রূপসী মায়াময়ী শহর কোলকাতা। তারি কিন্তু রেশ লেগে গেছে এখন থেকে দোকানদার আর দিন-এনে-দিন-খাওয়া ফুটপাথে বসা ফেরিওয়ালাদের চোখে-মুখে। চোখ থেকে উপছে পড়ছে বিকিকিনি সম্ভাবনার স্বাপ্নিক আলো আর খৈ ফুটছে মুখে অনর্গল কথার তোড়ে। কেমন একটা বেপরোয়া হৈ-হুল্লোড়ের আমেজ লেগে গেছে চারিদিকে।

বেপরোয়া ভাবে বাবুদের সাথে রসিকতা করা আর অশ্লীল কথাকে পর্দার আড়ালে রেখে বিচিত্র হাঁফ ছাড়া কাল্লুর স্বভাব। সারাটা দিন হাঁক ডাক আর হাসি মশকরায় মাতিয়ে রাখে আশপাশের দোকানদার আর বুট-পালিশওয়ালাদের। কম বয়সি ছোকরাদের তো সে মধ্যমণি। শুকুরতো নাম দিয়েছে রাজকাপুর। ফুটপাথের রঙ্গমঞ্চে বিচিত্র জীবনের অভিনয় ক'রে চলেছে যারা দৈনিক তিরিশদিন তাদের কাছে আওয়ারা কাল্লু আওয়ারার রাজকাপুরেরই সমান।

আজ কিন্তু কাল্লুর ভাল লাগছেনা মোটেই। স্বস্তি পাচ্ছেনা

মনে কোনোরকমে। শালার দিনটাই খারাপ শুরু হয়েছে। বাক্সটাকে সামনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে কাল্লু। বিচিত্র মানুষের বৈচিত্রহীন স্রোতটা বয়ে চলেছে সামনে থেকে। দু'চারটে পা থেমে যাচ্ছে আশপাশের বাক্সর সামনে। রুক্ষ ময়লা চামড়ার ওপর পড়ছে নূতন পালিশের চমক আর টুংটাং করে দোয়ানি সিকির ঝনক উঠছে টিনের বাক্সগুলোতে।

দিন মহম্মদ, বীরবল, শুকুর, পরমেশ্বর।

একই জুতো, একই কালি, বিভিন্ন রং আর বিভিন্ন জাত।

তবু এক।

পেশা হাবিবুল্লাহ—কর্মই শ্রেষ্ঠ।

জান্নু আর চুপ করে থাকতে পারেনা। কাল্লুকে ডাক দেয়—ক্যা ওস্তাদ আজ বড়া খামোস!

হাসি ফুঠে ওঠে কাল্লুর মুখে, নেই এয়সি

ঃ একঠো বিড়ি পেলাওনা!

পকেট থেকে একটা আনি বার ক'রে জান্নুর দিকে ছুঁড়ে দেয় কাল্লু, প্যাহলে চা লা!

কোয়েকার ওটস্-এর খালি টিনটা হাতে করে চা আনতে উঠে যায় জান্নু। চা নিয়ে ফিরে আসে মিনিট কয়েকের মধ্যেই।

ঃ ক্যা ওস্তাদ কালকা খেল ক্যায়সা থা? রসের ছোঁয়াচ লাগে জান্নুর কথায়। কাল্লুর দেখা ছবিটা আগেই দেখেছে জান্নু।

ঃ মাত্ বোল বাপ......!

একটা এংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে হেলতে দুলতে চলে আসছে ওদিক থেকে। এরা কখনও ফুটপাথে দাঁড়িয়ে জুতো পালিশ করায় না, তবু কথার মাঝখানেই ডাক দেয় কাল্লু, সু সা-ই-ন্. পালিশ হোগা মেমসাব! দোআনা হোগা মেমসাব। শেষের কথাগুলো খানিকটা টেনে টেনে বলে।

মেয়েটা কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে দ্রুত পায়ে চলে যায়। চাপা হাসির রোল পড়ে যায় এদিকে।

কালো পুরনো ফিতে বাঁধা জুতোশুদ্ধ পা দু'টো থেমে যায় কাল্লুর বাক্সর সামনে। গম্ভীর হয়ে কাজ শুরু ক'রে দেয় কাল্লু।

চকচকে জুতোর দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে ধুতি পরা লোকটা পকেট থেকে একটা দোয়ানি বার ক'রে দেয়।

অবাক হয়ে ওর মুখের পানে তাকায় কাল্লু—চার আনা বাবু।

কথা শুনে মনে হয় লোকটা পূর্ববঙ্গীয়, আরে এই যে তুমি ডাইকতাছিলা—দুই আনা!

ঃ উ তো মেমসাবকা লিয়ে—বিনা দ্বিধায় উত্তর দেয় কাল্লু।

আর একবার চাপা হাসির রোল বয়ে যায় আশপাশের ছোকরাদের মুখে।

কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় লোকটা, তবু একবার শেষ চেষ্টা করে, তা তিন আনাই লও।

ঃ কম নেই হোগা—গম্ভীর হয়ে ওঠে কাল্লুর মুখ।

অগত্যা একটা সিকি ফেলে দিয়ে রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে এগিয়ে যায় লোকটা।

সহজ হয়ে আসে কাল্লু তার স্বাভাবিকতায়, পালাট্।

উচ্চ হাসির রোলে ফেঠে পড়ে সবাই উৎকট আনন্দের আতিশয্যে।

এতক্ষণে সম্পূর্ণ ভাবে জমে ওঠে ফুটপাথের পরিবেশটা।

দুপুর

ধূসর রঙের মেটে আকাশটায় পূর্ণ জ্যোতি বিকিরণ করে দুপুরের সূর্য। তাপটা কিন্তু ভালোই লাগে শীতকাল ব'লে। লোক চলাচল কিছুটা কমে গেছে পথে। আজ শনিবার, ঘণ্টা দেড়েক পরে আবার ভ'রে উঠবে ফুটপাথ আপিস-আদালত ছুটি হবার পরে। দুপুরেব খাওয়া সারতে চলে গেছে অনেকে। কাল্লুও উঠে গেছে কিছুক্ষণ আগে। খাওয়া সেবে নিয়েছে জান্নু, বীরবল আর এরসাদ।

খায়নি কেবল পরমেশ্বর।

পরমেশ্বরের মা বুড়ির আজ অসুখ বেশ কিছুদিন ধবে। রাঁধতে বাড়তে পারেনা ; তবু চালিয়ে নিচ্ছিল পরমেশ্বর একবেলা রেঁধে দুবেলা খেয়ে। কাল রাত্রে তাও পারেনি। রুটি বানাবার সময়ই পায়নি। প্রায় সমস্ত রাতই কাটিয়েছে মাকে পাশে নিয়ে। বুড়ি বোধহয় আর বাঁচবেনা। ইচ্ছে ছিল আজ একটু সকাল সকাল ফিরে যাবে কিন্তু শনিবারের বেশী-রোজগারের সম্ভাবনায় তাও যেতে পারছে না। তাই থেকে থেকে উদাস হয়ে পড়ছে পরমেশ্বরের মনটা।

দূর আকাশে ক্লান্ত পাখায় নিরুদ্বেগে চক্কর কাটছে কয়েকটা চিল। এরসাদ মিয়া যথারীতি বসে বসে ঝিমুচ্ছে নিজের বাক্সর সামনে। জানু পরমেশ্বরের কাছ থেকে উঠে গিয়ে বীরবলের সাথে কথা বলছে হেসে হেসে। খুব সম্ভব সিনেমার গল্প করছে। বীরবল সিনেমা দেখে খুব কম, তাই সুযোগ পেলেই সকলে ঠাট্টা করে ওকে, 'শালা চমড়ি যায় পর দমড়ি না যায়, আরে কভিতো কুছ খরচ কর জিন্দগীকে লিয়ে।' থেকে থেকে ওদের হাসির রোলে ঝিমুনি কেটে যাচ্ছে এরসাদ মিয়ার। দুপুর বেলা খাওয়ার পর আধঘণ্টা ঝিমানো এরসাদ মিয়ার বরাবরকার অভ্যাস। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ জিরিয়ে না নিলে হাত চালানো সম্ভব নয় ওর পক্ষে। এ সময়ে কদাচিৎ কোনো খদ্দের এলে অম্লান বদনে পাশের লোককে দেখিয়ে দেয় বুড়ো এরসাদ।

প্রথমদিন এমনি একটা খদ্দেরের কাজ ক'রে ছ'টা পয়সা এরসাদ মিয়াকে দিতে গিয়ে ভীষণ ভাবে অপ্রস্তুত হয়েছিল পরমেশ্বর।

: নেই উ তেরা প্যায়সা হ্যায়, তে রাখলে—ঝিমোতে ঝিমোতে কথা বলে বুড়ো এরসাদ।

: লেকিন উতো তুমরা খরিদার থা! পরমেশ্বর সত্যিই আশ্চর্য হয়েছে। ফুটপাথের নিয়মে অপরের ধ'রে দেওয়া খদ্দেরের মারফত রোজগারের অর্ধেক পয়সা তার পাওনা হয়।

ঝিমুনি কেটে যায় এরসাদ মিয়ার—মেরা খরিদার! মেরা বাপকা খরিদার থা! পালিশ তেরা, মেহনত তেরা, আর প্যায়সা মেরা! কেমন যেন নতুন স্বরে কথা বলে এরসাদ মিয়া।

পরমেশ্বর ঠিক ধরতে পারেনা কথাগুলো।

: লেকিন আর সবকোই তো···

: সবকোইকো প্যায়সাকা জুরুরত হ্যায়—গলার স্বর পাল্টে

গেছে এরসাদ মিয়ার। মেরা প্যায়সা খায়গা কোন্? কিসের যেন একটা দরদের আভাস পাওয়া যায় এরসাদ মিয়ার কথাগুলোয়, কিন্তু ব্যস ঐ পর্যন্তই। আবার নিজের মনে ঝিমোতে থাকে বুড়ো এরসাদ—রাখ্‌লে রাখ্‌লে, কাম আয়গা।

আশ্চর্য লোক এই এরসাদ মিয়া। এত দিন এক সঙ্গে থেকে আজও পরমেশ্বর বুঝতে পারেনা ওকে। শুধু পরমেশ্বর কেন কেউই ওর কোনো হদিস পায়না। কোত্থেকে এসেছে, কে কে ছিল আর কেইবা আছে ওর তার কোনই খোঁজ পায়নি কেউ আজও। জিজ্ঞেস করলে কিছু বলেও না বড় একটা। সমস্ত দিনরাত পড়ে আছে ফুটপাথে। কারুর সাতে-পাঁচে নেই অথচ সকলেরই সাথে আছে বুড়ো এরসাদ। কথা বলে কম কিন্তু যখন বলে তখন না মেনে কেউ পারেনা ওর কথা। অমন যে ডাকসাইটে কাল্লু, সেও মান্য ক'রে চলে এরসাদ মিয়াকে।

কাল্লুর কথায় আবার মা'র কথা মনে পড়ে যায় পরমেশ্বরের। কাল্লুকে একবার বলা দরকার। বলবে বলেতো ঠিকও করেছিল কিন্তু যে কাণ্ডটা করল কাল্লু সকালবেলা! বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে পরমেশ্বরের বেদনায় আর অভিমানে। কাল্লুকে বড় ভালবাসে বুড়ি। কাল রাতে কত কথাই না বললো। পুরানো কথা। ঘর সংসারের কথা, পরমেশ্বরের বাবার কথা। কাল্লুর কথা। সমস্ত রাত ধরে কাল কথা বলেছে বুড়ি। বারবার বারণ করা সত্ত্বেও কথা বলছে অনর্গল।

ঃ মা বহোত রাত হো গিয়া, আব তুম শো যাও।

ঃ হাঁ বেটা আবতো শোনেই হোগা। যারা নজদিগ্‌ আ যা—ছেলেকে কাছে ডেকে পরম স্নেহে তার মাথায় মুখে হাত বুলোয় বুড়ি—হাঁরে কাল্লু কাঁহা হ্যায় রে?

আজকাল আর বড় একটা কাল্লু বস্তির দিকে যায় না। বেশ কিছুদিন হ'ল বুড়ি তাকে দেখেনি। অথচ একদিন ছিল যখন

পরমেশ্বর আর কাল্লু এক সাথে সমস্ত দিন খেলা করত ওদের আঙ্গিনায়। পরমেশ্বরের বাবা তখন বেঁচে। প্রথম যেদিন কাল্লুকে সঙ্গে ক'রে ঘরে নিয়ে এলো মা ; সেদিনের কথা আজও বেশ মনে আছে পরমেশ্বরের।

•••এক মাথা ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল। কালো গোলগাল চেহারা ; ওরই সমবয়সী ছেলেটা, কুতকুতে চোখ মেলে চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকায় চার পাশে। পরণে হাফপ্যাণ্ট আর খাকি বুশসার্ট। যুদ্ধের বাজার, চারিদিকে সকলেই খাকি পোষাক পরে ঘুরে বেড়ায় ফিটফাট হ'য়ে। পরমেশ্বরেরও অনেক দিনকার ইচ্ছে ওই রকম একটা জামা পরবে, কিন্তু বাবা তা কিছুতেই দেবে না।

ওই আর একটা অদ্ভুত লোক ছিল……

কোনোদিনই পরমেশ্বর ভালো ক'রে কথা বলতে পারেনি তার বাবার সাথে। আর বলবেই বা কখন! সপ্তায় এক-আধদিন ছাড়া কোনো দিনই বাড়ি থাকতো না পরমেশ্বরের বাবা ভুবনেশ্বর। রোজ রাতে কখন যে বাড়ি ফিরতো ওর বাবা তা এখনো ঠিক ক'রে মনে করতে পারে না পরমেশ্বর। কেবল মনে আছে, এক একদিন রাত্রে ঘুম ভাঙ্গা আচমকা চেতনায় দেখেছে ওকে বুকে জড়িয়ে ভীষণ ভাবে আদর করছে ওর বাবা।

ঃ মেরা বাচ্ওয়া, রামকা বাচ্ওয়া, পরমেশওর, লাল গওহর— বিশ্রী গন্ধ বাবার মুখে। ;আদরে অতিষ্ঠ হ'য়ে বাবার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে যতই ছট্‌ফট্‌ করে ততই বেড়ে যায় তার আদর,— খবরদার পরমেশওর কভি নেই দারু পিয়েগা। উঁ……মেরা বেটা আচ্ছা বনেগা।

ছাড়া পায় মা'র আগমনে। বাবার হাত ধরে দাওয়ার দিকে টেনে নিয়ে যায় মা, লো আব চলো, বহুত হুয়া।

ঃ কাহে, কাহে যায়ঙ্গে, মেরা বেটা হ্যায়, হ্যায় না পরমেশওর? যেতে যেতেও ঘুরে ঘুরে কথা বলে ওর সঙ্গে বাবা।

ঃ উ, দারু পিকে বেটাকো পেয়ার, সরম নেই লাগে! ঝাঁঝালো গলায় কথা বলে মা।

ঃ আলবত্ পিয়েঙ্গে। কাহে নেই পিয়েঙ্গে। কোই শালেকা প্যায়সা হ্যায়! কোন মানা করে! দাওয়ার ওপর বসে একটানা বকবক ক'রে চলেছে বাবা। মা'র গলার আওয়াজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। কেমন যেন ভয় ভয় করে পরমেশ্বরের। জোর করে চোখ দু'টো বন্ধ ক'রে চুপচাপ পড়ে থাকে বিছানায়। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে কোনো এক সময়ে। চোখ খুলে দেখে সকাল হ'য়ে গেছে।

স্নান সেরে পরিস্কার কাপড় পরে দাওয়ার ওপর বসে সুর ক'রে রামায়ণ পড়ে চলেছে বাবা,—যব রাম গয়ে বনবাস···

ভয়ে ভয়ে গুটি গুটি পায়ে বাবার কাছে গিয়ে বসে পরমেশ্বর। ওকে দেখে হাসি ফুটে ওঠে বাবার মুখে। বই পড়া শেষ করে কাপড়ের গেলাফে বইটাকে ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে চোখে মুখে লাগিয়ে ভক্তি ভরে চুম্বন করে বাবা, তারপর শুরু করে রামায়ণের গল্প।

অযোধ্যা, দশরথ, কৈকেয়ী, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরতের গল্প। বহুবার শোনা গল্প, তবু চুপটি করে বসে গল্প শোনে পরমেশ্বর। ভোরের শান্ত বাতাসে অদ্ভুত সুন্দব লাগে বাবার গল্প বলা। মনের ভয়-ভয় ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে যায়। এক সময় গল্পে গল্পে মেতে উঠে বাবার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দেয় পরমেশ্বর, রামজী বহুত সুন্দর থে না? হনুমানজী বড়া ভারী বীর থে না বাবা?

রান্নাঘর থেকে মা'র ডাক শোনা যায়—পরমেশওর, আরে ও পরমেশওর, মু ধো লে, চায় বন গিয়া।

তাড়াতাড়ি গল্প শেষ ক'রে উঠে পড়ে বাপ বেটায়—সমঝে বেটা, পিতৃআজ্ঞা পালন্ করনা রামজীকা শিক্ষা হ্যায়।

ওই একটা শিক্ষাই বাবার কাছ থেকে পেয়েছে পরমেশ্বর।

কতখানি পিতৃআজ্ঞা পালন করেছে তা ঠিক জানা যায় না, তবে জীবনে কোনোদিনই বাবার কথার ওপর কথা বলতে পারে নি পরমেশ্বর।

কাল্লুর জামা দেখে ওই রকম জামা পরার ইচ্ছেটা আর একবার ভীষণ ভাবে পেয়ে বসেছিল পরমেশ্বরকে, ছুটে গিয়েছিল বাবার কাছে। বাবা সবদিন বাড়ি থাকে না এ সময়; সেদিন কিন্তু কি কারণে যেন বাড়িতেই ছিল—"বাবা বাবা……" বাকি কথাটা আর কিছুতেই বলতে পারেনি পরমেশ্বর সাহস করে।

ঃ ক্যারে ক্যা হুয়া? হাসিমুখে কামরার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বাবা। কোনো কথা না বলে শুধু আঙ্গুল তুলে কাল্লুকে দেখিয়ে দেয় পরমেশ্বর।

ঃ কৌন হ্যায়রে লছমিয়া? স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে ভুবনেশ্বর।

ঃ কালুয়া হ্যায়, কালুয়া, জামালুদ্দিনকা বেটা—স্বামীর কথার উত্তর দিয়ে কাল্লুকে কাছে টেনে নেয় পরমেশ্বরের মা—আ বেটা আ।

দ্বিধা জড়িত পায় দাওয়ার ওপর উঠে আসে কাল্লু।

ঃ জামলকা বেটা। দু'পা এগিয়ে আসে ভুবনেশ্বর।

জামালুদ্দিনের লাশ যে দিন পাড়ায় এসেছিল সে দিন কেউ আর বাকী ছিলনা জড়ো হতে। অনেক দিন পর্যন্ত তার মৃত্যুর কথাটা আলোচনার বিষয় ছিল সকলের।

আহা বেচারা!

ঃ উস্‌স! মুখে আঙুল দিয়ে শব্দ ক'রে ইশারায় স্বামীকে চুপ করতে ব'লে তাড়াতাড়ি কাল্লুর মাথাটা বুকে চেপে ধরে লছমিয়া।

বাবার নাম শুনে জল ভরে আসে কাল্লুর চোখে।

নেই বেটা, রোয় নেই। কাল্লুকে আদর ক'রে দাওয়ার

ওপর বসিয়ে ত্বরিৎ-পায়ে ঘরে ঢুকে স্বামীকে কাছে ডাকে লছমিয়া—যারা শুন যাও।

বাবার পেছন পেছন পরমেশ্বরও ঘরে ঢোকে মার ডাকে।

ঃ ক্যা বাত ? উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে ভুবনেশ্বর।

ঘরের কোন থেকে চালছোলা ভাজার টিনটা বার করতে করতে কথা বলে লছমিয়া, উসকি মা……

হঠাৎ পরমেশ্বরের দিকে চোখ পড়তে মাঝপথে থেমে যায়। একটা বাটিতে চালছোলা ভাজা বার করে ছেলের হাতে দিয়ে বলে, লে বেটা উসকো দে।

বাটিটা হাতে করে কাল্লুর কাছে এগিয়ে যায় পরমেশ্বর, লো, মা দি হ্যায়।

বাটিটা কাল্লুর কাছে নামিয়ে রাখে পরমেশ্বর।

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে খেতে সুরু করে দেয় কাল্লু।

অবাক হয়ে ওর পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পরমেশ্বর। বিশেষ ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ওর জামাটা, ইস্ কতগুলো পকেট জামাটায় !

হঠাৎ মুখ খোলে কাল্লু, এ যারা পানি লানা !

কথা শুনে চমকে ওঠে পরমেশ্বর, পানি ! তাড়াতাড়ি কামরার দিকে এগিয়ে যায়, মা মা পানি মাগে।

মা আর বাবা দু'জনাই একই সঙ্গে বেরিয়ে আসে কামরা থেকে।

হাঁ হাঁ ঠিক হ্যায় বেটা, বলতে বলতে জল আনার জন্যে রান্নাঘরের দিকে চলে যায় মা।

পরমেশ্বরের হাত ধরে কাল্লুর কাছে এগিয়ে যায় ওর বাবা, কোই বাত নেই, কোই বাত নেই। আব তু য়াঁহি রহ যা। যায়সা৷মেরা পরমেশওর ওয়সা তুভি। আরে খা, খা বেটা খা যা—কাল্লুর মাথায় আদর ক'রে একবার হাত বুলিয়ে দেয় ভুবনেশ্বর।

কাল্লু আর পরমেশ্বর দু'জনাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পরস্পরের মুখের পানে।

আপন মনে এক গাদা কথা বলে বাবা, সামঝে পরমেশওর, ই তেরা ভাই হুয়া।

ঘটি করে জল নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে মা, লে বেটা পিলে।

মার দিকে তাকিয়ে অনর্গল কথা বলে চলে বাবা, শালা ক্যা জমানা হুয়া আঁ! এতনা জরা বাচ্চা—কোই বাত নেই, কোই বাত নেই, ভুবনেশওর হ্যায় যাবতাক তবতক কোই বাত নেই, ক্যা বোলো লছমিয়া! আগর মেরাই একঠো আওর হোতা; রামজীকা কিরপা হ্যায়! হাঁ তু আবসে য়্যাহি রহ যা বেটা; কোই ফিকর মত কর।

মা যতই বারণ করে বাবা ততই কথা বলে উচ্চস্বরে। বাবার স্বভাবই ছিল ওই রকম, যখন কিছুর খেয়াল হোত তখন চিৎকার করে বুক ঠুকে ঠুকে কথা বলতো একটানা।

কাল রাত্রে মাও বলছিল।

···যুদ্ধের দৌলতে টাকার তো আর অভাব ছিলনা ওদের। মিয়াজীর জুতোর সোল তৈরির কারখানায় দৈনিক সাতটাকা সাড়ে-সাতটাকা রোজগার করতো ওর বাবা আর খরচও করতে পারতো সেইরকম। বরাবর বাবুদের মতো করে ফর্সা ধুতি জামা পরিয়ে রাখতো পরমেশ্বরকে। তার ওপর শেষ বয়সের একমাত্র ছেলে বলে কখনো কোনো রকমের খরচ করতে কুণ্ঠিত হয়নি ওর বাবা। ওর নাম রাখার সময় তিনশো টাকা খরচ ক'রে জাতভাই সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে ছিল। তখনই তো সখ ক'রে রূপোর বালা দু'টো পরিয়েছিল ওর হাতে। তাই নিয়ে সকলের কত কথা, শালা প্যায়সা দেখায়ে, প্যায়সা!

কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় নি। বুক ঠুকে দরাজ গলায় সেদিনও

কথা বলেছিল বাবা, হাঁ হ্যায় তো। কোই শালাকা চোরি কিয়া? মেরা বেটা হ্যায়, হাম চাঁদিকা প্যাহনায়, সোনাকা প্যাহনায়, কোই শালাকা ক্যা। শালা কিসিকা ভালাই কোই দেখ নেই সকে!

সত্যি কারুর ভালো কেউ দেখতে পারে না। তা না তো কাল্লুর থাকা নিয়ে অতো কথা হয়। একদিকে ওদের জাতভাইরা বলে, 'মুসলমান কো জগা দিয়া'। অন্যদিকে কাল্লুকে ঠাট্টা করে সবাই— ক্যা বে, তে একদম মোচি বন গিয়া। কিন্তু তবু, তবু কাল্লু থেকে যায় ওদের সঙ্গে।

বাহাদুরি আছে ছেলেটার। অত অল্প বয়স থেকেই ভীষণ জেদি আর একরোখা ছিল কাল্লুর স্বভাব। আর সেই জন্যেই পরমেশ্বরের বাবাও ওকে ভালোবাসতো ভীষণ। বাবাও তো আর কম জেদি ছিল না। জেদের বশেই তো শেষ পর্যন্ত মরলো লোকটা। বাজি ধরে জেদ করে যেদিন গেলাসের পর গেলাস মদ খেয়ে রাত দুটোয় বাড়ি ফিরলো লোকটা সেদিনই তো প্রথম রক্ত উঠলো মুখ থেকে।

তারপর, তারপর মাত্র আর মাসখানেক বেঁচে ছিল পরমেশ্বরের বাবা। অমন তাগড়া শরীরের লোকটার বুকের ভেতর যে কাল্ রোগের পোকা কুরে কুরে খাচ্ছিল কেউ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি আগে থেকে।

সকলে নাকি বলেছিল হাসপাতালে দিলে সেরে যাবে, কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি করতে দেয়নি পরমেশ্বরের মা। হ্যাঁ সেবা করেছিল বটে কাল্লু। ওইটুকু ছেলে যে অতো কাজ করতে পারে তা কেউ চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না। পরমেশ্বরকে তো কাছেই যেতে দিতো না ওর বাবা। কাল্লু কিন্তু প্রায়ই বাবার কাছে বসে হাত বুলিয়ে দিত বুকে মাথায়। জল খাওয়াত, ওষুধ খাওয়াত। বাবা কাল্লুকেও বারণ করতো। ভীষণ বকত। কিন্তু তবু কথা

শুনতো না কাল্লু, উল্টে ধমক দিত বাবাকে—চুপ করো, আভি ফির খুন উঠ্‌ঠেগা তুমরা মুঁসে।

বেশ মনে আছে পরমেশ্বরের। সেই সময়ই এক একদিন রাত্রে কাল্লুকে আর ওকে এক সঙ্গে বসিয়ে ভাত খাওয়াতে খাওয়াতে মা আদর করে বলেছে, কাল্লু সাচমেই মেরা বেটা হ্যায়! না 'বেটা হাম তেরা মা হ্যায় না?

হ্যাঁ, আপন মা'র মতই কাল্লুকে ভালোবাসে ওর মা। কাল রাত্রেও অনেক অনেকবার ক'রে কাল্লুর কথা বলেছে মা। ওকে এক-বার যেতে বলেছে দেখবে বলে।

ঃ বেটা কাল্লুকো যারা আনে বোলেগা। বোলেগা যারা মোলাকাত করকে যায়। হাম আর নেই বাঁচেগেঁ।

সত্যিই মা বোধহয় আর বাঁচবে না।

বেদনায় টন্‌টন্ ক'রে ওঠে পরমেশ্বরের বুকটা। বাবার মৃত্যু-শোকটা ঠিক বুঝতে পারে নি পরমেশ্বর, আজ কিন্তু থেকে থেকে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে বুকটা।

সকাল বেলা কাল্লুর গালাগালি আর কালির শিশি ভেঙ্গে যাওয়ার কান্নার পেছনে মা'র মরে যাওয়ার সম্ভাবনার বেদনা কতখানি ছিল তা ঠিকমত পরিমাপ ক'রে বলতে পারা যায় না।

দুপুর বেলার খাওয়া সেরে ফিরে এসেছে অনেকে। কাল্লুও সবে এসে বসেছে, এমন সময় খবরটা নিয়ে আসে কামরু। কামরু বিয়ে করেছে আজ মাস কয়েক হ'ল। তাই আজও, রোজ দুপুর বেলা ভাত খেতে যায় বাড়িতে।

অনেকক্ষণ থেকেই দুঃসংবাদটার প্রতিক্ষায় ছিল পরমেশ্বর, তবুও হাঁউমাঁউ করে কেঁদে ওঠে মা'র মৃত্যু-সংবাদ শুনে। কাল্লুকেও কম ধাক্কা দেয় না খবরটা।

বুড়ির দান কম নেই ওর জীবনে।

বুড়ো এরসাদ মিয়া সান্ত্বনা দেয় পরম দরদ ভরে, রো মাত বেটা, মা কিসিকা বরাবর নেই রহে।

আর সকলের চোখও ছল্‌ছল্‌ ক'রে ওঠে ওর কান্না দেখে। জুতো পালিশের বাক্সটা ফেলে রেখেই ঘরমুখো রওনা হয়ে যায় পরমেশ্বর। পেছন থেকে ডাক দিয়ে বলে কাল্লু, তে চল্‌, হাম আরহেঁ।

দুঃসংবাদ নিয়ে ভাবালুতা করার মত সময় নেই কারুর জীবনে। বুড়ো এরসাদ মিয়া আবার বসে পড়ে নিজের বাক্সর সামনে।

একটু আগে জাম্মু ফুলে ফুলে কাঁদছিল খবরটা শুনে। জাম্মুর মা মরেছে মাসখানেক আগে। ভিজে গলায় ডাক ছাড়ে—ব্ল্যাক হোগা বাবু, ব্ল্যাক দো আনা।

কালো পালিশ, কালো চামড়া আর আঁধার কালো জীবন। জীবনযুদ্ধে রত জোড়া জোড়া হাত দ্রুত চলে ডাঁয়ে আর বাঁয়ে। চমকে ওঠে জুতোর আগা, ঝলক দিয়ে যায় আনি, দুয়ানি, সিকি।

ক্ষুধার অন্ধকার আকাশে ছড়ানো বিন্দু বিন্দু রূপোর তারা।

হাত চলে না শুধু কাল্লুর। মনের তলা থেকে তোলপাড় করে উঠে আসে কথাগুলো—পরমেশ্বরের মা মরে গেছে, কোন হতভাগী মা ফেলে গেছে তার নবজাতককে পার্কের কোণে, জরিনা মা হতে চায়......

দেড় মাস পরে হাসপাতাল থেকে ফিরেছিল জরিনা আর তার আরো মাস দেড়েক পরে জেলখানা থেকে ফিরে এসে ছিল রহমত। রক্ত আমাশায় ভুগে ভুগে জীর্ণ শীর্ণ রহমত কোমর সোজা করে হাঁটতে পারে না। সব চুরি হয়ে যাওয়া নিজের শূন্য ঘরে ফিরে এসেছিল দাগী চোর রহমত। বুক ছেড়ে কেঁদেছিল মাটিতে পড়ে শিশু বালকের মত—হায় আল্লা ইয়ে তুম ক্যা কিয়ে? আর

তার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়েছিল জরিনা,—আব্ ক্যা হোগা, হায় মেরা বাচ্চা।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে লোকগুলো। ফুটপাথের ফেরিওয়ালারা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাচ্ছে যে যার নিজের জিনিষ নিয়ে। কাল্লু টেরই পায়নি প্রথমে।

ঃ এ বে হল্লা—জাম্মুর চিৎকারে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় কাল্লু। নিজের বাক্সটা ফেলে পরমেশ্বরেরটা নিয়ে ছুটে যায় মসজিদের গলির দিকে। হল্লা-গাড়ীটা তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে মসজিদের গেটের সামনে। ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আশ-পাশের কয়েকটা ফেরিওয়ালাকে ধরে ফেলেছে পুলিশ। কাটা ফলওয়ালার টুকরিটা উলটে গেছে পথের ওপর। গোটাকয়েক কমলা লেবু গড়াচ্ছে এদিক ওদিক। সু-বয় আর ফেরিওয়ালারা তখনো ছুটছে প্রাণের ভয়ে।

বুনো গরু ভেড়ার মতো তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে হল্লা-পুলিশ।

বিটের পুলিশকে দৈনিক জলখাবারের পয়সা জুগিয়েও স্বস্তি নেই কারুর জীবনে. বিচিত্র কোলকাতার ফুটপাথে বসে রোজগার করনে-ওয়ালাদের এ-এক বিচিত্র ব্যবস্থা। ঘুষও দিতে হবে রোজ, আর হল্লা এসে ধরেও নিয়ে যাবে। আবার ফাইনও দিতে হবে কোর্টে। অবশ্য ছাড়া পাবার অন্য নিয়মও আছে।

একটা পুলিশের ঠোক্কর লেগে উলটে যায় কাল্লুর বাক্সটা। জেট্ ব্ল্যাকের শিশিটা ভেঙ্গে যায় চুরমার হয়ে।

জব্বার মিয়ার দোকানে ঢুকে পরমেশ্বরের বাক্সটা রেখে আবার বাইরে বেবিয়ে আসে কাল্লু। হল্লার তাণ্ডব চলেছে তখনো। গাড়ীটা এগিয়ে এসে থেমেছে গলিপথটার মুখে। খোলা ট্রাকটার ওপর বিভিন্ন রকমের ফেরিওয়ালাদের একটা বাজার বসে গেছে। পথচারি-

দের বেশ একটা বড় অংশ ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে মানুষ ধরার। বুড়ো এরসাদ মিয়াও ধরা পড়েছে। একটা নতুন বাচ্চা চানাচুরওয়ালা কাঁদতে সুরু করে দিয়েছে ভয়ে—আরে বাপ্পারে ছোড় দিহি সরকার।

বুড়ো এরসাদ মিয়া ধমকের সুরে সান্ত্বনা দেয় তাকে—আবে চুপ, মরদকা বাচ্চা রোতা কাহে!

বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। উল্টো মুখে ঘুরে স্টেট্‌স্‌ম্যান অফিসের দিকে পা চালায় কাল্লু। তারপর সোজা গিয়ে ওঠে প্যারাডাইস সিনেমায়।

শো শুরু হতে তখনো বেশ কিছুটা সময় বাকী আছে। লবিতে আর ফুটপাথে গাদাগাদী ঠাসাঠাসি ভীড়। আলু-থালু বেশে উছল পায়ে হেসে কেঁদে নিজের বিশেষ ভঙ্গীতে লোকজনের গা ঘেঁসে ঘেঁসে ভিক্ষে করছে জরিনা—ভাগবান তেরা ভলা করে, রাজা বাবু, আচ্ছে বাবু।

দূর থেকে জরিনাকে দেখতে পায় নি কাল্লু, কাছে এসে নজরে পড়ে যায়। মাড়োয়াড়ি যুবকটার একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জরিনা।

ঃ যা যা হট্, একটু সঙ্কুচিত হয়ে দু'পা পেছিয়ে যায় যুবকটা।

নিপুণ হাসির অব্যর্থ অস্ত্র ছুড়ে আরো একটু এগিয়ে যায় জরিনা, —মেরে রাজা বাবু।

অগত্যা। পান কেনার ফিরতি পয়সা থেকে একটা আনি ফেলে দিতে হয় ওর হাতে। পয়সাটা দেবার সময় একটুখানি আলগোছে বোধহয় ওর হাত লেগে যায় জরিনার হাতে। শিরশিরে আর একটা হাসির রঙে ঠোঁট রাঙ্গিয়ে ত্বরিৎ পদে ঘুরে দাঁড়ায় জরিনা।

ঃ শালি! অস্ফুট উচ্চারণ করে যুবকটা।

জরিনা ততক্ষণে এগিয়ে গেছে আর একজনার কাছে—রাজা বাবু।

আজ এখনো কিছু খাওয়া হয়নি জরিনার। গতকালের রোজগারের সবটুকুই রাগের মাথায় দিয়ে এসেছে দারওয়ানজীর হাতে। তাই ভিক্ষে করার গতিটা আজ আরো একটু ত্বরিৎ। হঠাৎ কাল্লুর পানে চোখ পড়তে থতমত খেয়ে যায় জরিনা। সকাল-বেলার ঘটনাটা মনে পড়ে যায় এক ঝলকে। সকালের পর থেকে বার বার মনে হয়েছে আজ একবার কাল্লুর সাথে দেখা করা দরকার। কিন্তু এখনো দেখা ক'রে উঠতে পারেনি সঙ্কোচে আর সময়ের অভাবে।

কাল্লু এগিয়ে আসে দু'পা। পরমেশ্বরের মা'র খবরটা দেওয়া দরকার জরিনাকে। ডাক দেয়—শুন যা, যারা শুন যা জরিনা।

দুলে ওঠে জরিনার মন।

শুনবে বইকি! অনেক, অনেক কথা আজ শোনার আর বলার আছে জরিনার।

হাতের পয়সা কটা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে এগিয়ে আসে জরিনা, ক্যা ?

পরমেশ্বরের মা'র মৃত্যু সংবাদটা বলা. দরকার জরিনাকে। কিন্তু কি ভাবে যে কথাটা পাড়বে ওর কাছে তা' ঠিক ভেবে উঠতে পারে না কাল্লু। কাল্লু জানে খবরটা ভীষণ ভাবে আঘাত দেবে জরিনাকে। জরিনার সঙ্গে তো আর কম সম্বন্ধ ছিল না পরমেশ্বরের মা'র। বিশেষ করে যখন হাসপাতালে ছিল জরিনা তখন পরমেশ্বরের মা'ই ছিল একমাত্র মেয়েছেলে যে ওকে রোজ দেখতে যেত একবার ক'রে।

বলি বলি করেও কেমন যেন কিন্তু কিন্তু ক'রে কাল্লু, হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, কাল রাত···

ধড়াস্ ক'রে ওঠে জরিনার বুকটা। কাল রাতের কথাই যে পাড়বে কাল্লু তা আগে থেকেই আন্দাজ করেছিল জরিনা, তবু ধড়াস্ করে ওঠে ওর বুকটা। কিন্তু না আর কোন সঙ্কোচ নয়। সকাল থেকে বার বার নিজের মনের কাছে ভেঙ্গেচুরে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে জরিনা। বলা দরকার, সব কথা কাল্লুকে খুলে বলা দরকার। এ ভাবে আর নিজের কাছে থাকতে পারে না জরিনা। এখনো খাওয়া হয়নি। তা হোক। একবার যখন সুযোগ এসেছে। কাল্লু যখন নিজে এসে ডাক দিয়েছে তখন এ সুযোগ হাত থেকে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

কাল্লুর কথার মাঝখানেই ওকে থামিয়ে দেয় জরিনা, হিঁয়া নেই চলো, মেরা ভি বহোত বাত হ্যায়। নিঃসঙ্কোচে কাল্লুর একটা হাত ধরে জরিনা।

চলতি পথের ভীড় কাটিয়ে কার্জন পার্কের শেষ সীমানায় ঝাঁকড়া বাদামগাছটার তলায় গিয়ে বসে দু'জনায়।

এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে কাল্লু। জরিনার সঙ্গে কাল্লুর পরিচয় আজ নতুন নয়, তবু ওর ব্যবহারটা আজকে নতুন বলেই মনে হয়। সত্যি বলতে কি, তখন ওর হাতটা চেপে ধরায় একটু হকচকিয়েই গিয়েছিল কাল্লু।

গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে আঁচল দিয়ে ঘসে মুখটা একবার মুছে নেয় জরিনা। তারপর সোজা চোখ তুলে তাকায় কাল্লুর পানে। নিঃসঙ্কোচ, পূর্ণ, দ্বিধাহীন দৃষ্টি।

কাল্লুর প্রশ্ন করার আগেই কথা শুরু করে জরিনা। কোথাও কোন জড়তা নেই ওর স্বরে।

: তুম হামকো নাফরাত কারো না! লেকিন কাহে? কাহে তুম নাফরাত কারোগে? —তুমি আমায় ঘৃণা কর না! কিন্তু কেন? কেন তুমি আমায় ঘৃণা করবে?

চমকে ওঠে কাল্লু। অদ্ভুত প্রশ্ন করেছে জরিনা। প্রশ্ন তো

নয়, জ্বলন্ত অঙ্গারের কয়েকটা ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে পড়েছে কাল্লুর কল্‌জের ওপর। পোড়ার জ্বলুনি অনুভব করে কাল্লু। কিন্তু না, না, এ হতে পারে না, মিথ্যে, এ কথা মিথ্যে জরিনা। সমস্ত অন্তরাত্মা প্রতিবাদ ক'রে ওঠে কাল্লুর। ইচ্ছে করে দু'হাতে মুখ চেপে ধরে রুদ্ধ ক'রে দেয় জরিনার কথা। কিন্তু ছেদ নেই জরিনার কথায়, একটানা বলে চলেছে জরিনা।

আজ জরিনা মরিয়া—মেরা মেরা সব কুছ তুম জানো! আগর তুম চাহতে, কাহে, কাহে মেরা এয়সা হোতা! আজ ক্যা হ্যায় মেরা, কোন হ্যায় মেরা! মেরা ঘর, মেরা আদমী, মেরা বাচ্চা······আর, আর পারে না বলতে জরিনা। সমস্ত শক্তি নিয়ে আকাশে ওড়া হাউইটার মতো হঠাৎ ফুরিয়ে গিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে অজস্র ধারায় ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে জরিনা।

কি কথায় কি কথা এসে পড়েছে। আজ একি কৈফিয়ৎ তলব ক'রে বসেছে জরিনা কাল্লুর কাছে! কি উত্তর দেবে কাল্লু!

হতবাক নিস্তব্ধ কাল্লু চেয়ে থাকে জরিনার পানে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রূপোলী সূর্যের চূর্ণ কিরণধারা ছড়িয়ে পড়েছে জরিনার রুক্ষ এলায়িত কেশের ভাঁজে ভাঁজে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে দুলে দুলে কাঁদছে জরিনা।

আরও একদিন। হ্যাঁ আরও একদিন ঠিক এমনি ভাবে কেঁদেছিল জরিনা। সেদিন ছিল না কোনো প্রশ্ন, চায়নি কোনো কৈফিয়ৎ; শুধু কেঁদেছিল ফুলে ফুলে আর দুলে দুলে, করুণ মিনতির সুরে। ঝরে ঝরে পড়েছিল সেদিন সব কান্নার মুক্ত ধারাগুলো।

মা-মরা মেয়ে সৎমার ঘরে বাপের ঘাড়ের বোঝা হয়ে উঠেছিল

জরিনা। আর পয়সার জোর ছিল রহমতের। দোজবরে হলেও ওই পয়সা দেখেই জরিনার বাপ মিয়াজী বিয়ে দিয়েছিল মেয়ের সঙ্গে রহমতের। তখন অবশ্য কেউ জানতো না রহমতের কারবার কিসের। জানাজানি যখন হ'ল তখন মিয়াজী আর নেই ইহ জগতে। লোকে অবশ্য বলাবলি করেছিল জরিনার সৎমা নাকি সব কিছুই জানতো আগে থেকে। বে আইনী চোলাই মদ আর চোরাই মালের কারবার ছিল রহমতের।

নিত্য নতুন শাড়ী গয়না আর খানাপিনার হুল্লোড়ে বিয়ের পরে মাসকয়েক বোঝবার আগেই কেটে গিয়েছিল জরিনার রহমতের আদর করার চোখ ধাঁধানো জৌলুসে। তারপর একটু একটু করে সন্দেহ হয় জরিনার। প্রায়ই অতো রাত করে মদের নেশায় চুর হয়ে সোনাদানা নিয়ে কোত্থেকে বাড়ি ফেরে রহমত! প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়না কিছু, শুধু বলে—মেরা হ্যায়, রাখলে।

ভয়ে ভয়ে বাক্স খুলে তুলে রাখে জরিনা সোনার বালা, চুড়ি, আংটি।

সেদিন রাতে চমকে ওঠে জরিনা রহমতের হাতে হার দেখে। এ হার কোত্থেকে পেলো রহমত! এযে তার সহেলী সেলিমার বিয়ের হার।

ঃ ই কিসকা হার হ্যায়? হাতের মুঠোয় হারটা নিয়ে প্রশ্ন করে জরিনা।

ঃ মেরা হ্যায়, রাখলে—চিরাচরিত স্বাভাবিক উত্তর রহমতের।

ঃ সাচ বোলো কাঁহাসে মিলা তুমকো—কঠিন হয়ে ওঠে জরিনার চোখ দুটো।

ঃ কাহে? আশ্চর্য হয়ে জরিনার মুখের পানে তাকায় রহমত।

ঃ ই সেলিমাকা হার হ্যায়, উসকো সাদিমে মিলাথা—উত্তেজিত হয়ে উঠেছে জরিনার কণ্ঠস্বর।

হো হো ক'রে হেসে উঠে সমস্ত ব্যাপারটাকে হালকা করে দেবার জন্যে তরল কণ্ঠে কথা বলে রহমত—হোগা সায়েদ, উসমে ক্যা!

রাগে আর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে জরিনা—তুম, তুম চোর হো!

আচমকা রূঢ় আঘাতে আর্তনাদ ক'রে ওঠে রহমত—ক্যা, ক্যা বোলে তুম!

: সব কোই ঠিক বোলেহে তুম চোরিকা কারবার করো—ভীত সন্ত্রস্ত জরিনা পেছিয়ে যায় দু'পা।

: ক্যা ক্যা বোলে! চোরিকা কারবার! হাম চোর হ্যাঁয়! ক্ষিপ্ত উত্তেজনায় জরিনার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে রহমত—বোলেগি, বোলেগি আর কাভি চোর।

: হাঁ হাঁ বোলেগেঁ, আলবাত বোলেগেঁ—কান্না-রুদ্ধ গলায় একটানা চিৎকার করে চলে জরিনা—তুম চোর হো, চোর হো, চোর হো।

এত কথা অবশ্য জানতো না কাল্লু। রহমতই বলেছিল ওকে। কাল্লুর সঙ্গে যে জরিনার পরিচয় ছিল ছেলেবেলা থেকে সেকথা জানতো রহমত। পাড়ার আর পাঁচটা ভবঘুরে ছেলের মতো কাল্লুকেও নিজের কাজে লাগিয়ে ছিল রহমত। চোরাই মদ বিক্রির কারবারে খদ্দের ধরে আনতো কাল্লু।

সকাল বেলা রহমতের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কাল্লু। রোজই একবার যায়। কাজের অছিলায় দেখে আসে জরিনাকে।

হতাশায় ভেঙ্গে পড়া রহমত উদাস নয়নে আকাশের পানে তাকিয়ে বসে ছিল দাওয়ায়। আঙ্গিনায় ঢুকে রোজকার মত চিৎকার করে কথা বলে কাল্লু—আরে ক্যা বাত আজ, বড়া সবেরেই নিন্ টুট্ গিয়া রহমত ভাইকা!

কথা বলতে বলতে চঞ্চল নয়নে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে

দেখে কাল্লু। চিৎকার ক'রে কথা বলার একটা উদ্দেশ্য আছে। ওর গলার স্বর শুনে সাধারণত অন্তরাল থেকে সামনে বেরিয়ে আসে জরিনা।

আকাশের দিক থেকে চোখ নামিয়ে কাল্লুর মুখের পানে তাকায় রহমত।

চমকে ওঠে কাল্লু—একি আশ্চর্য চেহারা আজ রহমতের। খেয়াল হয়, তাইতো চারিদিক এত নিস্তব্ধ কেন? কথা বলতে বলতে থেমে যায় কাল্লু।

: বয়েঠ্, য়্যাহাঁ বয়েঠ—অদ্ভুত ধরা গলায় কথা কটা ব'লে নিজের পাশে জায়গা দেখিয়ে একটু নড়ে বসে রহমত।

ধড়াস ক'রে ওঠে কাল্লুর বুকটা, কি ব্যাপার! জরিনার কিছু হয়নি তো! তাড়াতাড়ি রহমতের পাশে বসে উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করে—ক্যা, ক্যা বাত হ্যায় রহমত ভাই? ঘর এয়সা শুনা কাহে?

: চলি গই—হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে রহমত।

সমস্ত রাত ধরে কাল কেঁদেছে রহমত। চলে গেছে। কাল অতো রাত্রেই ঘর ছেড়ে চলে গেছে জরিনা। বলে গেছে, আর মুখ দেখবে না রহমতের। তখন আটকাতে পারেনি রহমত। মাতাল উচ্ছৃঙ্খল রহমতের জীবন থেকে কারুর চলে যাওয়া যে এতখানি বাজতে পারে তা নিজেও ভাবতে পারেনি রহমত। তাই জরিনার চলে যাওয়ার সময় আটকাতে পারেনি তাকে বরং উল্টে চিৎকার করেছিল পরম তাচ্ছিল্যে—যা যা আভি নিকাল যা, বড়া আই হ্যায় নেকিকা গুড়িয়া—যা যা বেরিয়ে যা, ভারি আমার পুণ্যের পুত্তলি রে।

আশ্চর্য! সারা রাত ধরে ঘুরে ফিরে এই একটা কথাই মনে পড়েছে রহমতের। পাপ করেছে। পাপ করেছে রহমত। জরিনাকে তাড়িয়ে দিয়ে মহাপাপ করেছে রহমত। জরিনাকে

বিনা রহমতের জীবন চলা দুঃসহ। জরিনাকে ভালোবেসেছে রহমত।

আর্তনাদ করে ওঠে কাল্লু। এ্যাঁ কব্! চলে যাওয়ার অর্থ মরে যাওয়া বুঝেছে কাল্লু।

ঃ কাল রাত কো, হামসে বিগাড়কে চলি গই। কান্না ভেজা মুখ তুলে কাল্লুর দুই কাঁধে হাত রাখে রহমত—সায়েদ মা কনে গয়ি হ্যায়।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কাল্লু, তাই ভালো,—কাহে, ক্যা হুয়াথা ?

রাতের সমস্ত কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে রহমত। ধরা গলায় মিনতি করে, মেরা এক কাম কর দে কাল্লু, জিন্দাগীভর তেরা এহসান মানেঙ্গে। তে যা, তে যাকে লে আ, তেতো .উসকা বাচ্পানকা সাথী হ্যায়। হাম জানেসে নেই আয়গী। বোলেগা হাম ই কাম ছোড় দেঙ্গে। সাচ্ বোল রঁাহে কাল্লু, হাম ই কাম আব বিলকুল ছোড় দেঙ্গে।

জরিনার কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ে বানুবিবি।

ঃ আয় হ্যায় ই ক্যা বাত !

ঃ হাঁ মা হাম আব উহা নেই যায়েঙ্গে।

কপালে করাঘাত ক'রে পা ছড়িয়ে দাওয়ার ওপর কাঁদতে বসে বানুবিবি—তুম কাঁহা গ্যায় গো, যারা শুন যাও তুমরা লাডলিকা বাত।

বাড়িওয়ালীর কান্না শুনে ছুটে আসে আঙিনার সব ভাড়াটেরা, আয় হ্যায়, ক্যা হুয়া ! ক্যা হুয়া গো।

ঃ আর হোগা ক্যা ! মেরা তগ্দির, যারা ই ছোকরিকা বাত তো শুনো—আর একবার কপালে করাঘাত করে বানুবিবি।

গতকাল অত রাত্রে জরিনাকে হঠাৎ আসতে দেখে

সকলের মনেই নানান রকম সন্দেহ গুজগুজ করছিল। এতক্ষণে ব্যাপারটা জানবার সুযোগ পেয়ে সকলেই একটু উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে।

ঃ যারা বোলো ভি বুবু আখের হুয়া ক্যা ?

ঃ হাম বোলে লড়কি মেরা আই হ্যায় মাকো দেখনে! গলার স্বরে অজ্ঞতার ভাব ফুটিয়ে একটানা কথা বলে চলে জরিনার সৎমা, ও আল্লা সো নেই, বিবি আই হ্যায় বেওয়া বেকস্ মা কা গরদন পর রহনে। বোলে ক্যা' মেরা মরদ জো কারবার করে উ বহোত বুরা কাম হ্যায়। হাম উহা নেই রহেগেঁ।

তিন ছেলের মা রহিমা বিবি গালে আঙুল ঠেকিয়ে ঘাড় কাত ক'রে অবাক হয়ে বলে, হায় আল্লা মরদকা নামমে এয়সা বাত !

বেওয়া বুড়ি, খাতুন বিবি ঘুরে দাঁড়ায় কোমরে হাত দিয়ে, বাবা হামলোগকা তো জিন্দাগী কাট গিয়া। কভি কোই বোলে যারা, উন্‌কা মু্‌পর এক বাত ভি বোলা হোগা।

বানুবিবি খেই ধরে পুরানো সুরের, যারা তুমহিলোগ বোলো! বোলে মরদলোগ বাহার ক্যা কারবার করে নেই করে, উসব তেরা দেখনেকা ক্যা!

কান্না পায় জরিনার। আজ যদি মিয়াজী বেঁচে থাকতো। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ত্বরিৎ পায় ঘরের ভেতর উঠে যায় জরিনা।

জরিনাকে একটা কথাও বলতে না দেখে সকলে একটু হতাশই হয়ে পড়ে। অবাক হ'য়ে মেয়ের চলে যাওয়ার পানে তাকিয়ে আবার কপালে করাঘাত করে কান্না সুরু করে বানুবিবি, হায় আল্লা গো, আব মেরা ক্যা হোগা গো।

তাড়াতাড়ি সকলে সান্ত্বনা দেয় সমস্বরে, আহা রো মত বুবু, রো মত।

ঃ থভি কোই রোনেকা বাত হুয়া।

ঃ তুম দামাদকো বোলা ভেজো। উ আকে লে যা গা॥ বোলনেই সে তো আর সব কুছ হোগা নেই।

কাল্লু একেবারে গাড়ী নিয়ে পৌঁছায় মিয়াজীর ওখানে। একটু আশ্চর্য হলেও কাল্লুকে দেখে খুশিই হয় বানুবিবি, হাম জানে দামাদ ওইসা লড়কাই নেই হ্যায়। ছোকরিকা যায়সা বাত!

ঃ হাঁ হাম গাড়ী লেকেই আয়হেঁ। রহমত ভাই ভেজ দিয়া জরিনাকো লে জানেকে লিয়ে।

ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে, কাল্লুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ওর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায় জরিনা, চলো।

মুহূর্তের জন্য থতমত খেয়ে যায় কাল্লু।

অপর কেউ কিছু বলবার বা বোঝবার আগেই আঙ্গিনা পার হয়ে সোজা গাড়ীতে গিয়ে বসে জরিনা। বানুবিবিকে সালাম করে ত্বরিৎ পায় এগিয়ে যায় কাল্লু।

এতক্ষণে কথা ফোটে অপর সকলের মুখে—যারা দেমাগ দেখে ছোকরিকা!

মানুষের মন বিচিত্র।

মেয়েদের মন বোধ হয় বিচিত্রতর!

কাল রাত্রে রহমতকে ছেড়ে চলে আসবার সময় প্রতিজ্ঞা করেছিল জরিনা, আর ওর মুখ দেখবে না। সকালবেলা সৎমার গঞ্জনা শুনতে শুনতে ভাবছিল মনে মনে, একমাত্র রহমতের কাছে ফিরে গেলেই বোধ হয় শান্তি পাবে মনে আর কাল্লুকে দেখে মনে হয় ওর সম্পূর্ণ অন্য এক কথা।

কাল্লু কোনোদিন খোলাখুলি ভাবে প্রেম নিবেদন করেনি জরিনার কাছে। তবু, তবু জরিনার মনে হয় কাল্লু ওকে ভালবাসে।

যে কথা কাল্লু কোনদিন বলতে পারেনি মুখ ফুটে সেই কথাই হঠাৎ বলে ফেলে জরিনা, চলো, চলো আওর কাঁহি হামলোগ চলে যাঁয়।

হঠাৎ আসা জোয়ারের মত ফুলে ফেঁপে তোলপাড় করে ওঠে কাল্লুর মন। সেই প্রথম। জীবনে প্রথমবার আওয়ারা উদ্দেশ্যহীন জীবনের একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পায় কাল্লু। নতুন করে কল্পনা করে আর একটা জীবনের। যে জীবনের সবটুকুই জরিনা। সরল কৈশোরের খেলার সাথী জরিনা। আওয়ারা যৌবনের দুরন্ত স্বপ্ন জরিনা। আর আত্মনিবেদিতা দূরের ডাক দিয়ে যাওয়া প্রেমিকা জরিনা। মনের গহন বনের অন্ধকারে মুঠো মুঠো জোনাকিরা জ্বলে আর নেভে। পরদা ঢাকা ফিটনের দুলকি চালের দুলুনিতে ডুবে যায় জীবনের সব কোলাহল……

: এ বাঁচকে, চাবুকের শব্দ তুলে ঘোড়াকে আঘাত করে কোচওয়ান। চাবুক পড়ে কাল্লুর চেতনায়। রহমত অপেক্ষা করছে জরিনার পথ চেয়ে, 'হাম জীন্দাগী ভর তেরা এহসান মানেঙ্গে কাল্লু— জীবনভোর কৃতজ্ঞ থাকবো কাল্লু'। মরে যাওয়া কণ্ঠে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলে কাল্লু, রহমত ভাই চোরিকা কারবার বিলকুল ছোড় দেগা বোলা হ্যায়।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে জরিনা। মরমে মরে গিয়ে করুণ মিনতির সুরে দুলে দুলে আর ফুলে ফুলে কাঁদে জরিনা।

সেই একদিন কেঁদেছিল জরিনা আর আজও কাঁদছে জরিনা। কেন? কেন এত কান্না এলো জরিনার জীবনে? আর কেনই বা কাল্লু পেলোনা জরিনাকে নিজের আপন করে? কুলহীন মা'তো একদিন বিয়ে দিতে চেয়েছিল কাল্লুর সাথে জরিনার।

ত্বলহীন মার নামে আতঙ্কে শিউরে ওঠে কাল্লু। মনে পড়ে যায় পরমেশ্বরের মা মরে গেছে আজ, জরিনাকে বলতে হবে সে কথা।

ধীরে অতি ধীরে হাত বাড়িয়ে জরিনার মুখ তুলে ধরে কাল্লু, রো মত, রো মত জরিনা, পরমেশওর কি মা আজ মর গয়ি।

দরদভরা কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায় কাল্লুর।

কান্না থেমে যায় জরিনার।

অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টি নিয়ে কাল্লুর মুখের পানে তাকিয়ে থাকে জরিনা আর কাল্লুর চোখে ঝরে নতুন দৃষ্টির জ্যোতিধারা। জরিনা সুন্দরী, জরিনা যৌবনা জরিনা অনন্যা।

অনেক, অনেকক্ষণ ধরে নিশ্চুপ বসে থাকে তু'জনায়।

গাছের পাতায় পাতায় নাচে রুপালী সূর্যের কিরণ ধারা। ঘাসের সবুজে কাটে শীতের তুপুরের ক্লান্তি। দূর আকাশে ভাসে মেঘের টুকরো ভেলা। আর পঙ্কিল শহরের বুকে বাদাম গাছতলাটুকুতে ছোঁয়া লাগে স্বর্গের নির্মলতার।

······বাদাম্, চিনা বা-দা-আম্···

চমকে স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে তু'জনায়। কাল্লু ভাবছিল জরিনার কথা আর জরিনা ভাবছিল পরমেশ্বরের মার কথা। পরমেশ্বরের মার কথায় যে কথা মনে পড়ে যায় জরিনার সে কথা জরিনা আর ভাবতে চায় না কোনো দিন। না না সেদিন আর কখনো আসবে না জীবনে। তা কখনো হতে দেবে না জরিনা। জরিনা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জরিনা মা হবে।

দৃঢ় শান্ত স্বরে কথা বলে জরিনা—তুম য়্যাকিন মানো, হাম কুছ বুরা নেই কিয়া। আওরাত মা হোতি হ্যায়।

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে কাল্লু।

উঠে দাঁড়ায় জরিনা।

: চলো, রহমতকো আব লে আনে হোগা। হামলোগ

আবতাক খানা নেই খায়া—অকম্পিত পায়ে হাঁটতে সুরু করে জরিনা।

পঙ্গু স্বামীকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিতে হয় ভিক্ষে চাইবার জায়গাতে আবার তুলেও নিয়ে আসতে হয়। আজকাল জরিনার সাহায্য বিনা দু'চার পাও হাঁটতে পারেনা রহমত। আজ সকালে নিউ মার্কেটের কাছে বসিয়ে দিয়ে এসেছে, এখন অনেকটা পথ হাঁটতে হবে; তাই একটু জোরে জোরে পা চালায় জরিনা।

পার্কের গেট পেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে জরিনা। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে চেয়ে দেখে কাল্লু। মনে পড়ে যায় ডাক্তারবাবুর কথাটা, জরিনা বোধ হয় আর মা হবে না কোনদিন।

একবার ইচ্ছে হয় চিৎকার করে বলে, 'জরিনা মাত যাও'—জরিনা যেওনা ও পথে। আবার নিজের মনেই থেমে যায় কাল্লু, না যাক। জরিনা সত্যিই অনন্যা।

ফিরে আসে কাল্লু নিজের বসবার জায়গায়। আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে চারিদিকে। সু-বয় আর হকারবা ফিরে এসেছে যে যার নিজের কাজে। পূর্ণ স্রোতে বয়ে চলেছে মানুষের দল। শনিবারের আমেজ লাগানো শহর ক্রমে উঠেছে নিজের বিচিত্রতায়, ট্রাম, বাস আর যানবাহনের কোলাহল ছাপিয়ে ক্ষুধার ডাক উঠছে বিচিত্র সুরে—সাড়ে ছে আনা—সু-সাইন, হোয়াইট হোগা বাবু হোয়াইট।

কিছুক্ষণ আগেকার হল্লার কোনো চিহ্নই নেই শহরের বুকে। শুধু সাদা ফুটপাথের ওপর সকাল বেলাকার লাল কালির দাগের পাশে দাগ পড়েছে আর একটা। কালো। জেট্ ব্ল্যাক।

দূর থেকে জরিনাকে আসতে দেখে শুকনো মুখে হাসি ফোটে রহমতের। রহমত আজ খুব খুশি। শনিবারের বাজারে রোজগার হয়েছে বেশ ভালো। সকাল বেলা আড়াই টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে দারওয়ানজীকে। বাকিটুকু রাত্রে দিয়ে দেওয়া যাবে। ক্ষিদে লেগেছে অনেকক্ষণ ধরে, তবু একটা পয়সাও খরচ করেনি রহমত। আজ খানা খাবে জারিনার সঙ্গে এক সাথে বসে। তাই শুকিয়ে উঠেছিল মুখখানা অনেকক্ষণ ধরে কিছু না খাওয়ার জন্যে।

জরিনা কাছে আসতেই খলখল ক'রে কথা বলে রহমত—এতনা দের হুয়া! খায়ের কোই বাত নেই, চলো, বহোত ভুখ লাগা হ্যায়।

রহমতের কথা বলার ধরণ দেখে কিছুটা আন্দাজ করতে পারে জরিনা।

ঃ বহোত খুশ দেখে আজ! কেতনা হুয়া আজ? স্বামীর কথার উত্তর না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করে জরিনা।

মনের খুশি আর চেপে রাখতে পারে না রহমত। হেসে ফেলে জরিনার কথা শুনে।

: বহোত, বহোত হুয়া হ্যায়, দেখোনা। এক টাকা পাঁচ আনার মত পয়সা দেখায় রহমত।

নিজের আঁচল খুলে পয়সাগুলো বার ক'রে গুণে দেখে জরিনা। আনা দশ এগার হবে।

: মেরা জাদা নেই হুয়া—মুখ কাঁচুমাচু ক'রে ঠোঁট বাঁকায় জরিনা।

: দেখে দেখে, জরিনার হাত থেকে পয়সা নিয়ে গুনে দেখে রহমত—কোই বাত নেই, কোই বাত নেই, বহোত হ্যায়। আভি তো রাত বাকী হ্যায়। চলো বহোত ভুখ লাগা হ্যায়—পয়সা ক'টা আর নিজের পয়সাগুলো এক সঙ্গে মিশিয়ে জরিনার হাতে তুলে দেয় রহমত।

পয়সাগুলো আঁচলে ভালো ক'রে বেঁধে কোমরে গুঁজে দেয় জরিনা। জরিনার গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপটে গিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে ডেরায় ফেরে রহমত। অনেকটা পথ আসতে হয়েছে। হাঁফিয়ে পড়েছে ভীষণ। তবু, তবু খুব খুশি হয়েছে রহমত। পথে আসতে আসতে আরো আনা তিনেক রোজগার হয়ে গেছে। তারিফ করতে হয় জরিনার। গুরু বোঝা অসহায় পঙ্গু স্বামীকে নিয়ে পথ হাঁটতে হাঁটতেও রোজগারের কথা ভুলে যায় নি জরিনা। অদ্ভুত করুণ হাসি ফুটিয়ে মুখে এক নাগাড়ে হেঁকে এসেছে সারাটা পথ—রাজা বাবু, দে দে বাবু, আল্লা তেরা ভলা করেগা, ভগওয়ান তেরা ভলা করেগা।

পা ছড়িয়ে ব'সে সুখের হাসি হাসে রহমত—যা আব কুছ লে আ।

দেয়ালের ধারে রাখা কুঁজো থেকে লোটায় ক'রে জল গড়িয়ে আনে জরিনা—লো তুম মু হাত ধো লো। খাবার কিনে আনার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যায় জরিনা।

: চার সাব এক রূপিয়া তিন আনে, এ এক নম্বর মে পানি দে, দো রোটি আধা কালিয়া এক চায় বনেগা, আপকা? আপকা? চায়! সিরিফ চায়। তিন, তিন চায় রহেগা, আগা সাহাব সাত

আনে…খাদে চড়ায় মিশিয়ে অদ্ভুত ছন্দময় সুরে অনর্গল কথা বলতে বলতে ত্বরিৎ পায়ে টেবিলে টেবিলে ঘুরে কাজ করে চলেছে আবদুল। শনিবারের বাজারে ভীড়ের কমতি নেই জব্বার মিয়ার দোকানে। এক মিনিট চুপ ক'রে দাঁড়াবার সময় নেই আবদুলের।

ঃ সাত আনে ক্যায়সা ?

আগা সাহেবের প্রশ্ন শুনে ছেদ পড়ে আবদুলের কথায়। এগিয়ে আসে জব্বার মিয়ার ক্যাশ টেবিলের সামনে। টেবিলের ওপর একটা হাত রেখে এক পায় দাঁড়িয়ে হিসেব দেয় গম্ভীর স্বরে—আধা স্টু চার আনে, দো রোটি দো আনে আওর এক চায় এক আনে।

ঃ এতনা খায়া! সুদখোর আগার পয়সার হিসাবটা মনে পড়ছে খানা খাবার পরে। পকেট থেকে একমুঠো খুচরো পয়সা বার করে একটা দুটো ক'রে হিসেব করে কৃপণ আগা সাহেব।

অনেকক্ষণ থেকে জরিনা ইশারায় বাইরে ডাকছিল আবদুলকে। এতক্ষণে সেদিকে চোখ পড়ে আবদুলের !

ঃ এক মিনট্। জরিনাকে একটু অপেক্ষা করতে ব'লে হাসিমুখে রান্নাঘরের ভেতর চলে যায় আবদুল।

আজ সকাল থেকে বার বার জরিনার কথা মনে পড়েছে আবদুলের। কিন্তু এরকম সময় জরিনা আবার এসে যে ওকে ডাকতে পারে সে কথা একবারও মনে হয় নি। মিষ্টি এক সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকে আবদুলের মন।

খাবারের পাত্র আর চা-ভরা পেয়ালাগুলো দু'হাতে থাকে থাকে সাজিয়ে দোল-খাওয়া শরীরে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে আবদুল। খদ্দেরদের সামনে চা খাবার দিয়ে দিয়ে তিন নম্বরের সালামকে কানে কানে কি কথা ব'লে আবার রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে আবদুল।

পয়সা দিয়ে হোটেল থেকে বেরোবার মুখে সামনে জরিনাকে দেখে খেঁকিয়ে ওঠে আগা সাহেব—এঃ যাও যাও, ইধার ক্যা!

পিত্তি জ্বলে যায় জরিনার। কিপটে আগাগুলোকে দু'চক্ষে

দেখতে পারে না ও। বেটারা ভিক্ষে দেবে না কোনো দিন এক পয়সা, অথচ ফুটানি দেখাবে যেন লাট সাহেব। ঘৃণায় চোখ কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে থুথু ফেলে জরিনা।

রান্নাঘরের পেছন দিককার দোর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে আবদুল। এগিয়ে যায় জরিনা। পুরনো ঢঙে বেঁকে দাঁড়িয়ে রসাল কণ্ঠে প্রশ্ন করে আবদুল—হায় ফির আ গই! বাত ক্যা?

আবদুলের চোখে চোখ রেখে কথা বলে জরিনা—আজ যারা মদদ্ কর দো ভাইয়া।

ঃ মদদ্! আর হাম্! আশ্চর্য হলেও খুশি মনে আবার প্রশ্ন করে আবদুল।

ঃ হাঁ যারা উধার কুছ খানা দিলাদো—কুণ্ঠিত কিন্তু আবদারের আমেজ লাগানো জরিনার কণ্ঠস্বরে।

একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে আব্দুল, কাহে। প্যায়সা নেই হ্যায়?

ঃ হ্যায়, মগর কুছ কম হ্যায়, চোখ নিচু ক'রে আঁচলের কোণটা আলগোছে একবার আঙুলে জড়িয়ে আবার খুলে ফেলে জরিনা।

ঃ কেতনা হ্যায়? সন্দেহ মেশানো সুর আবদুলের।

আনা আষ্টেক পয়সা আবদুলের হাতে দেয় জরিনা—বস এতনাই হ্যায়।

ঃ আরে ইতো বহোত হ্যায়! এবার সত্যিই একটু আশ্চর্য হয় আবদুল।

ঃ খানা ভি বহোত চাইয়ে, আদুরে হাসি হাসে জরিনা।

ঃ ক্যা বহোত চাইয়ে, তুম খাওগি ক্যা? অনেকটা সহজ হয়ে আসে আবদুল তার কথাবার্তায়।

ঃ চাওয়াল আওর কালিয়া—চোখ নিচু করে জরিনা।

ঃ আরেবাপরে,বোলে বাত ক্যা?হাসিঝলকায়আবদুলের চোখে

ঃ দিল চাহে, পলকে চোখ তুলে আবার চোখ নামিয়ে ঘাড় কাত করে জরিনা।

ঃ আয় হায়, খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে আবদুল।

ঃ বোলে খালি মজাক করোগে য়্যা দোগে ভি, সোজা মুখ তুলে রাগের ভান করে জরিনা।

ঃ নেই নেই দেরাহেঁ—রান্নাঘরে উঠতে গিয়েও রসিকতার সুযোগ ছাড়তে পারেনা আবদুল আবার ঘুরে দাঁড়ায়, বহোত ভুখ লাগা।

ঃ হাঁ খানা দো প্লেট দোগে।

ঃ দো প্লেট ?

ঃ হাঁ।

দু'প্লেট ভাত ছ'আনা আর কালিয়া আট আনা। আবদুল তার সাথে আবার এক আনার স্যালাডও এনে দিয়েছে। খাবারের দিকে চেয়ে মনে মনে একবার হিসেব করে নেয় জরিনা।

ঃ সাত আনা হাম পিছে দে যায়গেঁ আঁ।

ঃ দে যাওগি তো ? অদ্ভুত ভাবে হাসে আবদুল।

ঃ হাঁ জরুর দে যায়গেঁ, আজ রাতকো, নেইতো কাল্।

খুশি মনে খাবার নিয়ে ফিরে চলে জরিনা।

হাসতে থাকে আবদুল।

তালে তালে পা ফেলে কোমরে ভাঁজ দিয়ে দিয়ে হেঁটে যায় জরিনা······

······দু'পাশের উঁচু বাড়ীগুলো সবুজ ধান ক্ষেত আর মসজিদের কোলাহলপূর্ণ সরু গলিটা বদলে গেছে বাঁক খাওয়া খাওয়া সার্পিল আলপথে। মাথায় খাবারের বোঝা নিয়ে হেঁটে চলেছে যে, ঘরেতে না আসা সে মনের বধূটি······

আবদুল আজ বারো বছরের ওপর কোলকাতায় আর বয়সও হ'ল তার বাইশের অনেক বেশী। তবু, তবু আজও স্বপ্ন দেখে আবদুল মাঝে মাঝে আধ ঘুম চেতনায় সবুজ ধান ক্ষেত। এলানো আল পথ। মহুয়া গন্ধ বন। পলাশ রাঙা ফুল।

জব্বার মিয়ার গ্রামের ছেলে আবদুল। বাপ তার কাজ করতো খিদিরপুরের ডকে আর মাকে নিয়ে একলা গ্রামে থাকত আবদুল গ্রামের আর সকলের মতো তারও বিয়ে হয়েছিল বারো বছর বয়সে স্বপ্ন দেখার বয়স তখনো হয়নি আবদুলের, তবু ছবি ছিল মনে। গ্রামের আর পাঁচটা মেয়ে বউ রোজই দুপুর বেলা রুটি নিয়ে যেত মাঠে। মহুয়া তলার নিচে দিয়ে, পলাশগাছের গা ঘেঁসে, সবুজ ক্ষেতের আল বেয়ে, দলে দলে যেত তারা মাঠে। আর আবদুল ভাবতো তার কথা, যাকে গাওনা করে তখনো বাড়ীতে আনা হয়নি।

যে বছর জাপানিরা বোমা ফেললো কোলকাতায় সেই বছর গাওনা হবার কথা ছিল আবদুলের। বয়স তখন ওর ষোল। সেই বছর বাপ মরলো সেই বোমার আঘাতে আর মা মরলো তার এক বছর পরে।

ঘরেতে এলো না সে, যে ছিল মনের কোনেতে।

জব্বার মিয়া দেশে গিয়েছিল ছেলে মারা যাবার পর। আবদুল কোলকাতায় আসে জব্বার মিয়ার সাথে। বাড়িঘর যা কিছু ছিল সব বেচে দেড়শো টাকা পুঁজি এনেছিল সঙ্গে করে আবদুল। ইচ্ছে ছিল ব্যবসা করবে কোলকাতায়; কিন্তু ভালো বলতে হবে জব্বার মিয়াকে, সে টাকা খরচ করতে দেয়নি আবদুলকে। চাকরি দিয়েছে নিজের দোকানে। পনের টাকা মাইনে আর থাকা খাওয়া সঙ্গে। বলেছিল; ওটাকা দিয়ে কি আর ব্যবসা হবে! এখন তুই থাক, পরে পুঁজি যদি বাড়াতে পারিস তখন ভালো ক'রে দোকান দিস।

আজো সে টাকা জমা আছে আবদুলের পুঁজি। বেড়েওছে কিছু আকারে তবু ব্যবসা আর করা হয়নি। কি হবে ব্যবসা করে, কে আর আছে ওর! বরং থাক, যদি কোনো দিন কেউ আর আসে ওর ঘরে! ঘরের কথা মনে পড়লেই মনে পড়ে যায় সেই পুরানো ছবিটা—মহুয়া তলার নিচে দিয়ে, পলাশ গাছের গা

ঘেঁসে, সবুজ ক্ষেতের আল বেয়ে, দল বেঁধে চলেছে সব মাথায় রুটির বোঝা নিয়ে।

…জরিনাকে বড্ড ভালো লাগে। পঙ্গু স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে তালে তালে পা ফেলে ফেলে কোমরে ভাঁজ দিয়ে দিয়ে হেঁটে চলেছে জরিনা…

জরিনা মোড় ঘোরে।

আবদুল ঘাড় ফেরায়।

মুখের ওপর একবার হাত বুলিয়ে ত্বরিৎ পায়ে হোটেলে ঢুকে পূর্ণ উদ্যমে কাজ সুরু ক'রে দেয় আবদুল, দো চায়, এক রোটি, আধা কালিয়া, এ সাব কো পানি দে।

পরিপাটি করে পরিবেশন করে জরিনা।

ব্যঞ্জন তো মাত্র একটা, তবু গুছিয়ে ভাগ করে, পুরনো পরিষ্কার একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে, জল গড়িয়ে, একটা ভাঙা কাঁচের পাত্রে খানিকটা নুন নিয়ে পরিপাটি ক'রে পরিবেশন করে জরিনা।

রহমত চেয়ে চেয়ে দেখে ওর কাজ করা তারপর একই সাথে খেতে বসে দু'জনায়। ঝোল দিয়ে ভালো ক'রে মেখে মেখে পরম তৃপ্তি ভরে খায় রহমত।

এমন তৃপ্তিভরে অনেক দিন খাওয়া হয়নি। বিশেষ করে গুছিয়ে পরিবেশন করা তো জরিনা ছেড়েই দিয়েছে আজকাল। কেমন যেন একটু খিটখিটেও হয়ে গেছে ইদানিং। না হয়েই বা উপায় কি! এমন পঙ্গু অকর্মণ্য স্বামীকে নিয়ে ঘর করাতো আর বড় চারটিখানি কথা নয়! মায়া হয় রহমতের—লে থোড়া আওর খানা লে। নিজের পাত থেকে এক মুঠো শুকনো ভাত তুলে দেয় রহমত।

ঃ নেই নেই—বাধা দিতে চায় জরিনা।

ঃ খা লে, মেরে লিয়ে।

অনেক, অনেক দিন পরে, স্বামীর আদরের অনুরোধে এক মুঠো বেশী ভাত খেয়ে খাওয়া শেষ করে জরিনা।

খাওয়া দাওয়া সেরে আফিং-এর গুলিটা মুখে ফেলে আয়েস করে গড়িয়ে কাঁথায় গা জড়িয়ে টুকিটাকি টুকরো কথার গল্প শুরু করে রহমত। সকাল থেকে এ পর্যন্ত কি কি করেছে, কত রকমের লোক সব যাতায়াত করেছে পথে। ভিক্ষে দিয়েছে কে কি রকম। খোদার শোকর, দারওয়ানের টাকাটা আজ দিয়ে দেওয়া যাবে। না দিলে কি বিপদই না হ'ত।

আয়না চিরুণি নিয়ে চুল বাঁধতে বাঁধতে রহমতের গল্প শোনে জরিনা আর মাঝে মাঝে হুঁ হ্যাঁ ক'রে উত্তর দিয়ে চলে ওর কথার।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল আর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে চলেছে শীতের দিন। বড় রাস্তার দিকে শনিবারের জমজমাটের হৈ হুল্লোড় বাড়ছে ক্রমে ক্রমে। এদিকে কিন্তু বেশ শান্ত নিরিবিলি ভাব আছে এখনো। অসমাপ্ত বাড়িটার একতলার ছায়া ছায়া আলোতে জরিনার চুল বাঁধাটা দেখতে দেখতে তন্দ্রায় ঢুলে আসে রহমতের চোখ দু'টো।

চুল বাঁধা শেষ ক'রে, উঠে দাঁড়িয়ে পরা কাপড়টা একবার ঝেড়ে নিয়ে ভালো ক'রে পরে নেয় জরিনা।

বেলা পড়ে আসছে। আর দেরি করা চলে না। এর পরে গেলে ভালো জায়গা পাবেনা রহমত বসবার। শনিবারের বাজার, দেরি করে যাওয়া মানেই রোজগারের কমতি। রহমতকে ডাক দেয় জরিনা,—লো চলো। আব উঠ্ঠো ; সো গায় ক্যা!

ঃ নেই তো—তন্দ্রা ছেড়ে জেগে ওঠে রহমত।

এখন আর ফুটপাথে বসতে ইচ্ছে করছে না একটুও। শীতের দিনে সন্ধ্যায় যদি আর বাইরে না বসতে হ'ত। কিন্তু জরিনাকে বলা মুসকিল সে কথা। আর বলবেই বা কোন মুখে। বেচারী

একলা কত করবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আড়ামোড়া ভেঙে উঠে বসে রহমত।

এক টুকরো ছেঁড়া চট্, পুরনো একটা ছোট কাঁথা আর গায়ে দেবার ময়লা চাদরটা গুছিয়ে নিয়ে স্বামীকে সঙ্গে ক'রে পথে নামে জরিনা। আফিং-এর কৌটাটা পকেটে ফেলে, ভিক্ষে চাওয়ার টিনটা হাতে ক'রে জরিনাকে ধরে ধরে পথ হাঁটে রহমত।

পুরনো হোয়াইটওয়ে লেডল—নতুন মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স বিল্ডিংটার ধারে ভালো ক'রে বিছানা বিছিয়ে চাদরটা ভাঁজ ক'রে রেখে রহমতকে ধরে গুছিয়ে বসিয়ে দেয় জরিনা। আর একটু বেলা পড়লে চাদরটা গায়ে দেবার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এগিয়ে যায় জরিনা।

বিনা কারণে হঠাৎই কথাটা মনে পড়ে যায়। খবরটা তো এখনো বলা হয়নি রহমতকে ; এক পা এগিয়ে আবার স্বামীর কাছে ফিরে আসে জরিনা, একঠো বাত বোলনে ভুল গ্যায়থে।

ঃ ক্যা ?

ঃ পরমেশওর কি মা আজ মর গয়ি! খবরটা দিয়ে আর এক মিনিটও দাঁড়ায় না জরিনা।

ঃ য়্যাঁ কোন্ বোলা ? চমকে মুখ তুলে তাকায় রহমত। জরিনা ততক্ষণে মিশে গেছে পথের ভিড়ে।

খবরটার সাথে সাথে জরিনার ব্যবহারে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় রহমত, আহা বুড়িটা বড্ড ভালো ছিল ; কিন্তু জরিনা…হ্যাঁ ঠিক হয়েছে…পুরনো কথার খেই ধরে জরিনার ব্যবহার বুঝতে পারে রহমত……জেলখানায় থাকতে থাকতেই জরিনার খবর শুনতে পেয়েছিল রহমত। জরিনা ভুলেও মনে করতে চায়না সে কথাটা। হাসপাতালে থাকাকালীন বুড়ি কিছু কম করেনি ওদের জন্যে। নিজের অলক্ষে হাত দিয়ে চোখটা একবার মুছে নেয় রহমত। মনে পড়ে যায় অনেক, অনেক পুরনো কথা…পরমেশ্বরের মা…জরিনা…কাল্লু… কাল্লুর ঋণ কোনো দিনই আর শোধ করতে পারবে না রহমত।

জীবনের সবচেয়ে বেদনাময় কঠিন তিনটে মাস কিভাবে যে কাটিয়ে দিয়েছে কাল্লু সে কথা ভাবলে আজও কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে রহমত। পরমেশ্বরদের বাড়ি ছেড়ে তখন জরিনার সাথে এক বাড়িতেই থেকেছে কাল্লু। পাড়ার লোকে কথা বলেছে অজস্র, কিন্তু রহমতের মনে দাগ পড়েনি একটাও। রহমত জানে কাল্লুর কাছে সে চিরকৃতজ্ঞ।—জীন্দাগী ভব হাম তেরা এহসান মানেঙ্গে কাল্লু। আরো, আরো একদিন বলেছিল রহমত কাল্লুর হাত দুটো ধ'রে পরম মিনতি ভরে; যেদিন প্রথম রহমতকে ছেড়ে চলে যায় জরিনা।

গাড়ী থেকে নামিয়ে জরিনার হাত ধ'রে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় কাল্লু.—লো রহমত ভাই ই ওয়াপস আগই।

পুলকে আত্মহারা হয়ে কাল্লুর সম্মুখেই জরিনাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রহমত—হামকো মাফ করদে জরিনা।

স্বামীর বুকে মাথা রেখে অজস্র ধারায় কাঁদে জরিনা। কাঁদে রহমত আনন্দে আর পুলকে; আর সকলের অলক্ষে সেই বুঝি প্রথম জরিনার জন্যে কাল্লুও কেঁদে ছিল একটুখানি। দু'ফোঁটা চোখের জল, কে জানে আনন্দের না বেদনার! নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় কাল্লু।

ধরা গলায় কথা বলে রহমত,—সাচ., হাম সাচ্ বোল রহেঁ জরিনা, ই কারবার আওর কভি নেই করেঙ্গে।

পুরনো কারবার আর কখনো করেনি রহমত। মদ আর চোরাই মালের কারবার ছেড়ে সম্পূর্ণ আইন সঙ্গত না হলেও শুরু করেছিল বন্দকী কারবার। ঘরের সোনাদানা বেচে নতুন পুঁজি তৈরি করে নতুন কারবার শুরু করেছিল রহমত। বস্তির লোকদের সময়-অসময়ে এটা ওটা রেখে কিছু কিছু ধার দেওয়া আর টাকায় এক আনা সুদসমেত সে টাকা ফেরং নেওয়া। অন্য কোনো খেটে খাওয়ার পন্থা খুঁজে বার করা সম্ভব ছিল না

রহমতের পক্ষে। কাল্লুকে কিন্তু কাজে লাগিয়ে ছিল সম্পূর্ণ নতুন পথে। জরিনার পরামর্শে জুতো পালিশের সরঞ্জাম সেই সময়ই তো কিনে দিয়েছিল ওকে আর দিয়েছিল ফুটপাথে বসার ব্যবস্থা করে। পুরনো কারবার ছেড়ে দিলেও পুলিশের সঙ্গে তখনো খাতির ছিল বেশ। সেই খাতিরই তো শেষ পর্যন্ত……

না।আর ভাবতে পারে না রহমত। সোজা হয়ে বসে মুখ তুলে তাকায় সম্মুখে।

ফুটপাথের ভিড়, পথের কোলাহল আর সম্মুখের বিস্তীর্ণ মাঠের দিগন্ত পেরিয়ে পশ্চিম আকাশে অনেকটা ঢলে পড়েছে বিকেলের সূর্য। পড়ন্ত রোদের তীক্ষ্ণ ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে যায় রহমতের। চোখ দু'টো আর একবার দু'হাতে ভালো ক'রে মুছে নিয়ে ভিক্ষের টিনটা সামনে রেখে গুছিয়ে বসে রহমত। পথ চলতি ছোট্ট ছেলেটা তার মা'র কাছ থেকে একটা আনি চেয়ে নিয়ে টুং করে ফেলে দেয় ওর টিনে।

সন্ধ্যা ক্ষেপের প্রথম রোজগার। টিনটা একবার কপালে ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করে রহমত—খুশ রহো বাবা, জিতা রহো বাবা।

বাবার মৃত্যুর সময় এত কান্না কাঁদেনি পরমেশ্বর, আজ কিন্তু সারাটা পথ অঝোরে কেঁদে চলেছে এক নাগাড়ে।

রাম নাম সৎ হ্যায়। জীবনের যা কিছু সব মিথ্যে, রাম নাম শুধু সত্য। রাম বনবাসে গিয়েছিল পিতৃ আজ্ঞায়। পিতৃ আজ্ঞা পালন্ করনা হি রামজীকা সিক্সা হ্যায়। মৃত্যুর শেষ লগ্নে পরমেশ্বরকে কাছে ডেকে বলেছিল বাবা—মাকা বাত শুননা বেটা।

বাবার শেষ আদেশ মার কথা শুনিস্। আবার, আবার জল ভরে আসে পরমেশ্বরের চোখে। সব কথা শুনেও মার শেষ কথা শুনতে পায়নি পরমেশ্বর।

রাম নাম সৎ হ্যায়—যা কিছু সব মিথ্যে আজ, সত্য শুধু রাম নাম। কাঁধ বদলে আর এক কাঁধে খাটিয়া ধরে পরমেশ্বর। মুঠো মুঠো খৈ ছড়ায় জাতভাইরা শবযাত্রাপথে।

সম্পর্কে চাচা হয় বৃদ্ধ জ্ঞাতি একজন এগিয়ে এসে সান্ত্বনা দেয় দরদভরা কণ্ঠে, রো মত বেটা, রোনে নেই হোয়, নাম করো, রাম নাম সৎ হ্যায়। সত্য শুধু রাম নাম, যা কিছু আর মিথ্যে সব।

শেষ বার কাল্লুকে দেখতে চেয়েছিল বুড়ি, তাও আর হোল না। বেইমান! মিথ্যে সব মায়ার বন্ধন; একবার দেখতেও এলো না মরার পরে। এগিয়ে চলে পরমেশ্বর কাঁধ বদলে কাঁধ বদলে, রাম নাম সৎ হ্যায়, রাম নাম সৎ হ্যায়।

শেষ বারের মত সকলে এক সাথে গলা ছেড়ে ডাক দেয়, রাম নাম সৎ হ্যায়। নিভন্ত চিতা প্রদক্ষিণ ক'রে এক কলসি জল ঢেলে তর্পণ শেষ করে পরমেশ্বর—রাম নাম সৎ হ্যায়—সত্য শুধু রাম নাম, সব কিছু আর মিথ্যে। সব শেষ। মা ছিল। মা নেই।

সন্ধ্যা হ'তে আর বড় দেরি নেই। শীতের দিন বড় ছোট। একটা দু'টো আলো জ্বলতে সুরু করেছে সবে দোকানে দোকানে। রূপসী কোলকাতা তার আলোর মায়া নিয়ে জেগে উঠছে একটু একটু ক'রে। রঙিন আলোর বিজ্ঞাপনগুলো জ্বলছে আর নিভছে। আলোগুলো তার কিছুটা ফিকে ফিকে।

মিছিলটা এগিয়ে আসে ওয়েলিংটনের দিক থেকে। উৎকর্ণ হ'য়ে ওঠে সকলে। কোলকাতার বুকে মিছিল লেগে আছে হামেসাই, উৎকর্ণ হবার কিছু নেই তবু উৎকর্ণ হ'তে হয়; কি জানি আবার গুলি গোলা চলে নাকি।

মিলিত কণ্ঠের গানের সুর ভেসে আসে দূর থেকে। এবার উৎকর্ণ হয় কাল্লু। আশে পাশে লোক দাঁড়াতে শুরু হয়ে যায় একটা

হু'টো ক'রে। চলমান মানুষের স্রোতটা মন্থর হয়ে আসে একটু। জানলা খোলে দু'তলার, তিনতলার। ব্যালকনিগুলো ভরে ওঠে মেয়ে পুরুষ আর বাচ্চাদের ভিড়ে।

এগিয়ে আসে মিছিল। ধীর মন্থর গতি। পোষ্টার ফেসটুন আর ফ্ল্যাগে ফ্ল্যাগে সাজানো বিরাট মিছিল। বড় বড় ছবিওয়ালা রঙিন পোষ্টার সব।

চারিদিকে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। একটি কচি শিশুকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে রক্ষা করছে মা।

যুদ্ধ চাই না—শান্তি চাই।

উদ্ধত সৈনিকের সঙিনের মুখে বিদ্ধ হ'য়ে গেছে একটি নারীহৃদয়।

সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া ছাড়।

নীল আকাশে উড়ছে এক ঝাঁক পায়রা।

পীস্ ফর্ অল্।

মিছিল থেকে কিছু কিছু লোক বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পথের দু'ধারে। হাতে তাদের কাগজ। পথের ধারে দাঁড়ানো লোকগুলোকে কি সব বলছে, লিখে নিচ্ছে।

আরো এগিয়ে আসে মিছিল। গানের কথাগুলো ভেসে আসে আরো জোরে। বাঙলা দেশে বাস করেও বাঙালী নয় কাল্লুরা। বাংলা কথা সব বুঝতে পারেনা ঠিকমত। গানের সুরটা শুধু ভালো লাগে। বোঝা যায় কিসের যেন একটা ডাক দিচ্ছে গান। ঘুরে ফিরে শুধু একটি মাত্র কলি পঞ্চম থেকে সপ্তমে উঠে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার উদ্দাত্ত আহ্বান—শান্তি মিছিলে······

ছেলে মেয়ে বৃদ্ধ। নারীপুরুষের সমাবেশে অপূর্ব জমজমাট মিছিল।

একটি প্রৌঢ়া মহিলা এগিয়ে আসে কাল্লুর কাছে। হাতে একটি কাগজ, ওপরের দিকে খানিকটা নীল রং করা তাতে কয়েকটা পায়রা উড়ছে সারি সারি, নিচে কি সব লেখা।

ঃ আমন্ কা দস্তখত্ দিজিয়ে।

অবাক হ'য়ে যায় কাল্লু। কথাগুলো যে তাকেই বলা হচ্ছে তা সে প্রথমে বুঝতেই পারেনা।

আবার কথা বলে মহিলাটি, ইসমে আপ সহি দিজিয়ে।

বিস্মিত কাল্লুব মুখ থেকে কোনোবকমে কথা বেবোয় মাত্র একটি—হাম !

ঃ হাঁ জঙ্গকে খেলাপ য়ে আপিল হ্যায়।

ঃ লেকিন !

ঃ লেকিন ক্যা বেটা ! হাম মা হ্যাঁয়, হাম আপনে বেটোকো আব জঙ্গমে নহি মরনে দেঙ্গে।

বেটা ! জঙ্গ ! অবলুপ্ত হযে যায় সমস্ত মিছিল চোখের সামনে থেকে। আকাশটা নেমে আসে পায়েব তলায়। দুলতে থাকে সমস্ত পৃথিবী। ফুটপাথেব বেলিংটা ধবে ফেলে কাল্লু। থবথরে ফ্যাকাসে ঠোঁট থেকে জড়িয়ে জড়িয়ে বেবোয় দুটি কথা, লিখনা নহি আতা।

পাশের আব একটি মহিলাব কাছ থেকে কালির প্যাড্টা চেয়ে নিয়ে বাড়িয়ে ধবে মহিলাটি—আঙ্গুঠা দো বেটা।

নিজের সম্পূর্ণ অজান্তে কম্পমান বাঁ হাতটি বাড়িয়ে দেয় কাল্লু। বুড়ো আঙুলেব চক্রাকাব কালো রেখা ফুটে ওঠে সাদাকাগজের বুকে।

ঃ নাম ক্যা হায় বেটা ?

ঃ কাল্লু।

ঃ শুকরিয়া বেটা।

এগিয়ে যায় মহিলাটি। এগিয়ে যায় মিছিল।

পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে থর থর ক'রে। আকাশটা নেমে এসেছে মাথার ওপর—বেটা—জঙ্গ—মা……

ছুটে চলে কাল্লু বস্তির দিকে। পরমেশ্বরের মা মরে গেছে আজ। জরিনা মা হ'তে চায় !

জরিনা মা হতে চায়।

মিথ্যে, সব কিছু আজ মিথ্যে। পুরনো দিনের সব কথাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে চায় জরিনা। পরমেশ্বরের মা মরে গেছে, ভুলেও সে কথা মনে করতে চায় না জরিনা, তবু ভুলতে পারছে না কথাটা শোনার পর থেকে। কেন? কেন বুড়ি মরলো আজ? পুরনো দিনের সব কথাকে ভুলে গিয়ে উড়িয়ে দিয়ে নূতন ক'রে আবার যখন জীবনের স্বপ্ন দেখছিল জরিনা তখন কেন মরে আবার নতুন করে পুরনো কথা মনে পড়িয়ে দিল বুড়ি?

মরার ওপর রাগ থাকে না কারুর তবু রেগে ওঠে জরিনা মনে মনে।।রাগগিয়ে পড়ে কাল্লুর ওপর। কি দরকার ছিল ওর অমন করে খবরটা ওকে দেবার! নাইবা দিত খবরটা! কি হ'ত তাতে কাল্লুর!

কাল্লু, কাল্লু, আর কাল্লু, জীবনের অনেকখানি জরিনার জড়িয়ে গেছে কাল্লুর সাথে, দিনে রাতে। ভুলেও ভোলা যায় না। আশ্চর্য হয় জরিনা নিজের মনের হদিস পেয়ে। কাল রাত পর্যন্ত ভাবতে পারেনি একবারও আবার ওকে বসতে হবে কাল্লুর কাছে মনের ডালি খুলে। বলতে হবে মনের কথা মুখোমুখি বসে। দুপুর বেলা গাছ তলাতে বলে এসেছে সব কথা, তবু যেন মনে হয় বলা হয়নি কোনো কথা। কাল্লুকে আজো ঠিক চিনতে পারলো না জরিনা। আশ্চর্য! আশ্চর্য হয়ে জরিনা তলিয়ে যায় মনের অতল ভাবনাতে।

সে একদিন ছিল, কাল্লু যখন ছোট।

মা-মরা-মেয়ে জরিনা দিনরাত খেলা করতো ওদের বাড়িতে। বাইরের লোকতো সহজে বুঝতেই পারতো না ওকে অপর বাড়ির মেয়ে বলে। কাল্লুর বাবা তখন বেঁচে। কি ভালোই না বাসতো ওকে কাল্লুর বাবা। সুন্দর সুপুরুষ দিলখোলা মানুষ, বয়ের কাজ করতো গ্রাণ্ড হোটেলে। রোজ রাতে ভালো ভালো খাবার নিয়ে আসতো ঘরে। বেশ মনে আছে জরিনার, এক একদিন রাত্রে

ঘুমিয়ে পড়েছে ও আর কাল্লু একই সাথে—ফুলহীন মার বিছানায়। হঠাৎ দুপুর রাতে আচমকা ঘুম ভেঙে দেখে সামনে বসে কাল্লুর বাবা মিষ্টি গলায় কথা বলছে ঠোঙায় ভরা খাবার নিয়ে—খা লে, খা লে মা। এ কাল্লু কাল্লু লে খা লে।

নাম না জানা মিষ্টি খাবার, কি ভালোই না লাগতো খেতে। কাল্লু কিন্তু কিছুতেই খাবেনা। ঘুম-কাতুরে কাল্লু কিছুতেই খাবার খাবেনা। উল্টে কান্না জোড়ে—নেই, নেই খায়ঙ্গে হাম।

ঃ খা লে, খা লে বেটা—আদর করে কাল্লুকে তুলে বিছানায় বসিয়ে দেয় ওর বাবা।

ঘুম ভেঙে গেছে কাল্লুর তবু কিচ্ছু খাবেনা। ঘুম ভাঙিয়ে দেবার জন্যে রাগ হয়েছে ওর। গোঁ ধরে বসে থাকে চুপ করে—নেই খায়ঙ্গে।

জরিনা কিন্তু বেশ মজা করে খেয়ে চলেছে খাবারগুলো।

ঃ আরে দেখ দেখ কেতনা আচ্ছা মিঠাই হ্যায়, জরিনা সব খা গই—আবার কাল্লুকে আদর করে ওর বাবা।

হাসি মুখে কাছে এসে দাঁড়ায় ফুলহীন মা। ফুলহীন মা সকাল বেলার মতো এখনো সেজেগুজে আছে, ঠিক যেন কণে বৌটি।

ঃ জানে ভি দো, উ নেই খায়গা।

ঃ তুমরা বেটা বিলকুল বেকুফ্ হ্যায়, কুছ নেই খায়া, দেখো জরিনা সব খা গই—হাসতে থাকে কাল্লুর বাবা।

ঃ হাঁ মেরা বেটা বিলকুল বেকুফ্ হ্যায়—অদ্ভুত সুন্দর হাসি হেসে কাল্লুকে কাছে টেনে নেয় ফুলহীন মা।

লজ্জা পেয়ে কাল্লু মুখ গুঁজে নেয় ফুলহীন মার কোলে। কি বোকাই না ছিল কাল্লু ছোট বেলায়। অমনি ক'রে আরো একদিন লজ্জা পেয়ে কাল্লু মুখ গুঁজেছিল ফুলহীন মার কোলে।

পাড়ায় যেন কাদের একটা বিয়ে বাড়ী থেকে ফিরে এসেছে জরিনা আর কাল্লু। দাওয়ায় বসে আঙ্গিনার আর পাঁচটা মেয়ে বউ, বিয়ে বাড়ির গল্প শুনছে ওদের কাছে। মনের আনন্দে আত্মহারা

হয়ে অজস্র গল্প করে চলেছে ওরা। কত লোক, কত গাড়ী, কি সুন্দর সুন্দর পোষাক পরা ছেলেমেয়ে, তার ওপর আবার ব্যাণ্ড বাজনা। বিয়ে বাড়ির হাজারো মজা গল্প করে কি আর শেষ করা যায়! হঠাৎ প্রশ্ন করে ভাবি—তুলহীন দেখে?

ঃ তুলহীন! অবাক হয়ে মুখ তোলে কাল্লু।

ঃ হাঁ হাঁ দেখা, জিসকা সাদি হুয়া না—তাড়াতাড়ি উত্তর দেয় জরিনা।

ঃ তে একদম বেকুফ্ হ্যায়, সাদিমে গিয়া আর তুলহীন নেই দেখা—হেসে কাল্লুর গাল টিপে দেয় ভাবি।

ঃ হাঁ হাঁ দেখা, নিজের বোকামি কাটাবার জন্যে জোর দিয়ে কথা বলে কাল্লু—মেহদি থা হাতমে, একদম মা য্যায়সি—

হোহো করে হেসে ওঠে ভাবি—তো তেরি মা ভি তুলহীন হ্যায়!

ঃ হাঁ হ্যায় তো—মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে আরো জোরে নিজের কথা সমর্থন করে কাল্লু।

প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ে সবাই। অবাক হয়ে সকলের মুখের পানে তাকায় কাল্লু; এতে হাসির কথা কি আছে! কি এমন বলেছে কাল্লু! যার বিয়ে হ'ল, সত্যিই তো সে সেজেগুজে ছিল ঠিক মার মতো।

ঃ তো তেরি মা'কা ভি সাদি হোগা? হাসতে হাসতে রসিকতা করে ভাবি।

ঃ ধ্যাত্, একটু বিব্রত হয়ে পড়ে কাল্লু।

লজ্জায় রাঙা হয়ে কাল্লুকে কাছে টেনে নেয় ওর মা, তে একদম বেকুফ হ্যায়।

হাসিমুখে কাল্লুকে পথ বাতলায় ভাবি—ঠিক হ্যায়, তে আবকিসে তুলহীন মা বোলকে পোকারে গা।

এতক্ষণে লজ্জা পেয়ে মাকে তু'হাতে আঁকড়ে ধরে কোলে মুখ গোঁজে কাল্লু।

নামটা কিন্তু সেই থেকেই থেকে যায়—তুলহীন মা। জরিনাও

দুলহীন মা'ই বোলে ডাকতো কাল্লুর মাকে। বড্ড ভালো বাসতো কাল্লু দুলহীন মাকে। সেই দুলহীন মা'ই কিনা শেষ পর্যন্ত……

ব্রেক চাপার বিশ্রী একটানা শব্দ তুলে থেমে যায় গাড়ীটা। হৈ হৈ করে ওঠে পথের দু'পাশের লোকেরা। এখুনি একটা এ্যাকসিডেন্ট হ'ত। খুব বেঁচে গেছে বাচ্চা ছেলেটা। ছুটে এসে ছেলেটাকে কোলে তুলে নেয় ওর মা। ভদ্রলোক ওপারে চলে গিয়েছিলেন আগেই। তাড়াতাড়ি এপারে ফিরে এসে চাপা গলায় ধমক দেন স্ত্রীকে, এখুনি কি হ'ত বলতো !

চারিদিক থেকে মন্তব্য করে পথচারিরা, খুব বেঁচে গেছে মশাই।

ঃ যান যান ব'কে আর কি হবে।

ঃ আপনারই তো দোষ মশাই, পথে নেমেছেন ছেলে বউ নিয়ে, একটু সাবধানে চলতে পারেন না।

ছেলেটাকে বুকে চেপে নিশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটা। বেশ বোঝা যাচ্ছে ওর পা কাঁপছে একটু একটু ক'রে। আস্তে আস্তে ভিড় কেটে যায়। ভদ্রলোক তাড়া দেন—হোলো এবার ? চলো।

ছেলের মাথাটা বুকে আঁকড়ে ধরে মুখ তোলে মেয়েটা—না, হেঁটে যাব না, তুমি গাড়ী ডাকো।

আশ্চর্য হন ভদ্রলোক, গাড়ী !

ঃ হ্যাঁ, দৃঢ় কণ্ঠস্বর মেয়েটার।

ধীর পায়ে এগিয়ে যায় জরিনা। না আর পুরনো কথা নয়। পুরনো দিনের সব কথাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়ে নতুন ক'রে বাঁচবে জরিনা। জরিনা মা হবে।

রাত্রি

শীতের রাত তার কুয়াসার ঘোমটা টেনেছে আকাশের গায়। ভাঙা চাঁদটা আটকে গেছে সেই ঘোমটার আড়ালে, মুখটা তাই তার কিছুটা ঘোলাটে। শহরের বুকে কিন্তু চাঁদের জ্যোৎস্না নেই, আলো আছে নিয়নের। দূর পথের সাদা আলো আর মটরের লাল আলোগুলো একসাথে মিশে গিয়ে তারার ফুল কাটে। রূপসী কোলকাতা জেগে উঠেছে তার আলোর মায়া নিয়ে। মন ভোলানো, রঙ ফোটানো অজস্র আলোর মায়া। লাল, নীল, হলদে, সবুজ জ্বলছে আর নিভছে, হাতছানি দিচ্ছে।

হাতছানি দিয়ে ডাকছে অগুন্তি ফেরিওয়ালারা।

কলম। মোজা। উলেন গেঞ্জি। চাঁপা ফুল। লাটের মাল। সন্ধ্যা কাগজ। সেন্ট। নগ্ন ছবি।

হেঁকে চিৎকার করে, গান গেয়ে, বাঁশী বাজিয়ে, কানের কাছে ফিস্ ফিস্ ক'রে খদ্দের ডাকছে সবাই।

রাত বাড়ছে একটু একটু ক'রে। শহরের শনিবারের রাত।

ক্যাবারেট। ডান্স। ড্রামা। অজস্র হাসি আর গান। অজস্র গাড়ীর ভিড়। ফুটপাথে হাজারো লোকের মেলা।

রং শুধু রং। পোষাকে রং, আলোতে রং, চোখেমুখে শুধু রঙের খেলা।

রং ধরে রহমতের মনে। চাদরটা ভালো ক'রে মুড়ি দিয়ে আফিঙের নেশায় ঝিম মেরে চুপটি ক'রে বসে থাকে রহমত। আজ আর বোধ হয় কিছু রোজগার হবে না। ওর বাঁ পাশে একটু দূরে কোত্থেকে এক অন্ধ এসে জুটেছে, মিষ্টি গলায় গান গেয়ে ভিক্ষে চাইছে সেই সন্ধ্যে রাত থেকে। রাতের ক্ষেপে এমনিতেই তো ভালো রোজগার হয় না কোনোদিন রহমতের। তার ওপর আজ আবার ভালো এক আপদ এসে জুটেছে। রাতের কোলকাতায় যারা ঘুরে বেড়ায় তারা ভিক্ষে দিয়ে পয়সা নষ্ট করে না। পয়সা খরচ করে অন্য যে কোনো কারণে।

জরিনা এ বেলা রোজগার করে ভালো। রহমত জানে, সে রোজগার চটুল হাসি আর কটাক্ষের দান। ফুটপাথে থেকেও প্রথম প্রথম ভীষণ খারাপ লাগতো রহমতের, আজকাল আর লাগে না। শোকর লাখ শোকর। ভগবানের অপার করুণা; জরিনা আজো অন্য পন্থায় রোজগার করতে শেখেনি। ভিড়ের কোলা-হলের মাঝেও চুপ করে ঝিম্ মেরে বসে থাকে রহমত। অন্ধ ভিখিরির গলাটা সত্যি বড় মিষ্টি।

মিষ্টি হাসির ঝঙ্কারে ঝিম কেটে যায় রহমতের। মুখ তুলে চায় সামনে। পথের ভিড় তেমনি আছে, পাল্টে গেছে শুধু ধারাটা। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক বদলায় শহরের। ছন্দময় আলুথালু বেশে পরস্পরের কোমর জড়িয়ে সামনে থেকে হেঁটে চলেছে এক জোড়া মেয়ে পুরুষ; তাদেরই হাসির ঘায় ঝিম কেটে যায় রহমতের। শীত শীত করছে একটু একটু। বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না। অন্ধ ভিখিরিটা চলে

গেছে কোন এক ফাঁকে। হকারদেরও চিৎকার থেমে গেছে। এখন জরিনা এলে হয়। চাদরটাকে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে আবার ঝিম মেরে বসে রহমত।

দাওয়ার ওপর চুপটি ক'রে বসেছিল পরমেশ্বর। কাল্লুকে দেখে আর একবার ডুকরে কেঁদে ওঠে, কাল্লু মা নেই হ্যায়!

বুকের কাছে উঠে আসা কান্নাকে দু'হাতে ঠেলে দিয়ে পরমেশ্বরকে সান্ত্বনা দেয় কাল্লু, মা কিসিকা হামেসা নেই রহেরে পাগলা—মা কারুর বরাবর থাকে না;

মা, ভুলহীন মা।

এক আঙ্গিনার পাঁচ বাড়ীর কেউ কোনোদিন কাঁদতে দেখেনি ভুলহীন মাকে। বাবা যেদিন মারা যায় সেদিনও এক ফোঁটা জল ছিল না ভুলহীন মার চোখে।

বুক-ফাটা কান্না শুনে রাত দুপুরে ঘুম থেকে চমকে ওঠে কাল্লু। কান্না কিসের এতো! লোকজনের হট্টগোলে গম্‌গম্‌ করছে সারাটা আঙ্গিনা; আলোর বান ডেকেছে চারিদিকে। অবাক হয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে আসে কাল্লু। দাওয়ার উপর শোয়ানো রয়েছে কার যেন রক্তাক্ত একটা দেহ। কপাল চাপড়ে বুক ফাটা কান্না কাঁদছে ভাবি। নিশ্চল পাথরের মূর্তি ভুলহীন মা বসে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

কাল্লুকে দেখতে পেয়ে উঠে আসে ভাবি। হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয় ওকে মা'র কোলের কাছটিতে, নয়ী ভুলহীন লে, এই আব তেরা সব কুছ।

বুকের সা'থে কাল্লুকে জড়িয়ে নেয় মা, তবু এক ফোঁটা জল নেই মার চোখে।

কারা যেন আক্ষেপ করে, তগ্‌দির, সব কুছ তগ্‌দির ভাই!

: আহা এমন লোকটা মরলো গাড়ি চাপা পড়ে।

: ক্যা হুয়া? ক্যা হুয়া রে নয়ী তুলহীন? পাশের বাড়ীর কালা বুড়ি প্রশ্ন করে আঙ্গিনায় ঢুকে।

: কাল্লুকা বাপ চাপা পড়কে মর গিয়া।

এতক্ষণে বাপের লাশের পানে ভালো ক'রে তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে কাল্লু, মা, আব্বাকো ক্যা হুয়া মা?

থর থর ক'রে শুধু কাঁপে তুলহীন মা। কথা বলে ভাবি, বোল বোল নয়ী তুলহীন—তেরা বাপ আর নেই হায় কাল্লু।

নেই কাল্লুর বাপ আর নেই।

কি হাসিখুসি আর দিলখোলা লোকই না ছিল বাবা। রোজ রাতে খাবার আনতো ঠোঙায় ভরে। ঘুম থেকে তুলে খাওয়াতে চাইতো মিষ্টি খাবার। কাল্লু খেতো না, খেতো জরিনা। শুধু কি জরিনা! ছুটির দিনে কত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে করে নিয়ে আসতো বাবা। সমস্ত দিন ধরে চলতো খানাপিনা আর গান বাজনার হুল্লোড়। মাকেও যেতে হত সকলের সামনে। দিল খোলা মানুষের সবটাতেই ছিল বাড়াবাড়ি।

বস্তির লোকদের অবশ্য বরদাস্ত হত না এসব; কানাঘুষো করতো নানান কথা।

: ছি ছি মুসলমানকা ঘরমে ই সব ক্যা!

হো হো করে হাসতো বাবা ওদের কথা শুনে।

: দো দিনকা জিন্দাগীমে হায় ক্যা আওর? হাসির ঘায়ে উড়িয়ে দিয়ে জীবনের সব পুঁজি হারিয়েছিল লোকটা।

কথাটা বুঝতে পেরেছিল তুলহীন মা, বাবা মরার মাস কয়েক পরে। কোথাও কোন ধার রাখেনি জামালুদ্দিন, পুঁজিও কিন্তু এক পয়সা রাখেনিকো ঘরে। হাতের চুড়ি, গলার হার

সোনা-দানা যা কিছু ছিল একে একে ফুরিয়ে যায় সব মাস কয়েকের মধ্যে। তারপর শুরু হয় নানান ফিকির ফন্দী। সেই সময় বাবার বন্ধু হাসনু মিয়া সাহায্য করে এটা-ওটা দিয়ে।

হাসনু মিয়া বাবাব সঙ্গে আগেও আসতো বাড়ীতে। মা'র সঙ্গে কথা বলতো সামনাসামনি বসে। সেদিন রাতেও কথা বলে হাসনু মিয়া; কি যেন কি চাকরীর কথা। সব কথা ঠিক বুঝতে পারে না কাল্লু। দু'দিন থেকে ভাত খায়নি মা। চাল নেই বাড়ীতে।

ঃ নেই নেই, হাম নেই সকে র্গে—কাল্লুকে কাছে টেনে নিয়ে হাসনু মিয়ার সঙ্গে কথা বলে মা।

ঃ ই কোই খারাব কাম নেই হ্যায় ভাবি। দুসরা কাম কাঁহা মিলেগা? চারো তরফ খানা নেই, কাপড়া নেই, বহোত বুরা দিন আয়া হ্যায়। যাবা সোঁচকে দেখো, কাল্লুকা ক্যা হোগা।

কাল্লুর কি হবে? ওই একটা কথা ভেবে ভেবেই ঘুম নেই আজ ক'রাত দুলহীন মার চোখে। লোকের বাড়ীর বাসন মাজার কাজ তাওতো আর পাওয়া যাচ্ছে না। চেষ্টা তো আর কম করেনি গত দেড় মাস ধরে, কিন্তু…

ঃ লেকিন

ঃ লেকিন-উকিন নেই, কাল সাবেরে চলো, আপিস মে লে যায়েঙ্গে। রোজ তিন চার ঘণ্টেকা কাম হ্যায়, তুম গানা ভি জানো, সরকারি কাম হ্যায়, আচ্ছা প্যায়সা ভি মিলেগা। কতকটা স্বগতোক্তি উচ্চারণে কথাগুলো ব'লে ধীরে ধীরে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় হাসনু মিয়া।

কাল্লুকে বুকে জড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে দুলহীন মা। সেই প্রথম—সেই সব প্রথম দুলহীন মাকে কাঁদতে দেখে কাল্লু।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে পরমেশ্বর।

ঃ রো মত্, রো মত্ ভাই, রোনেসে মা নেই আয়গি—কাঁদলে যদি মা ফিরতো তাহলে আমিও কাঁদতাম তোর সঙ্গে গলা ছেড়ে।

মা কখনো ফেরে না।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কাল্লু দেখে মা চলে গেছে। ভেবেছিল ফিরে আসবে দুপুরে। দুপুর গিয়ে সন্ধ্যা গেলেও মা যখন ফিরলো না তখন খোঁজ সুরু করে কাল্লু। খোঁজ সেদিন পায়নি। পেয়েছিল অনেক পরে, তাও আবার চাপা চাপা খবর, সে এক কলঙ্কের ইতিহাস। যুদ্ধের বাজারে অমন নাকি হয়ে থাকে হাজারে হাজারে।

বাবা মরেছিল মিলিটারি ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে আর মা চলে গিয়েছিল মিলিটারি চাকরীতে হাসমৎ মিয়ার সঙ্গে ফৌজি দিলখুস সভায়।

সেই দিন থেকে মার আর কোনোদিন খোঁজ করেনি কাল্লু। মা'র কথা মনে পড়লেই বিষিয়ে উঠেছে মনটা রী রী করে ঘৃণায়।

ঘৃণা।

ঘৃণায় ছটফটিয়ে বারো বছরের ছেলেটা টো টো করে ঘুরে বেড়ায় এদিক সেদিক। কোনোদিন খাবার জোটে কোনোদিন জোটে না। ঘুমিয়ে থাকে এর ওর বাস্তর চালায়। পরমেশ্বরের মা'ই সেদিন কাছে টেনে নিয়েছিল ওকে। বুড়ির দান কম ছিল না ওর জীবনে।

কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে পরমেশ্বর। রাত হয়েছে অনেকটা। বস্তি থেকে বেরিয়ে আসে কাল্লু।

লাষ্ট শো শেষ হয়ে গেছে। শহরের বুকের শেষ জনস্রোত

ফিরে চলেছে ঘরমুখো। ট্যাক্সি, রিক্সা, ফিটন যানবাহনের শেষ কোলাহল আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। উঁচু উঁচু বাড়ী-গুলো বেশীর ভাগ সব দীপহীন নিঝুম। দু'টো একটা হোটেলে কেবল আলো জ্বলছে তখনো ; ধোয়া মোছা হচ্ছে বন্ধ হবার আগে। কুয়াসা নামছে ঘন হয়ে। পথের আলোগুলো সব ঘোলাটে। আকাশের তারাগুলো সব কাঁপছে থর্ থর্ করে। শীতের তীক্ষ্ণ বাতাসে কুঁকড়ে ফুটপাথে ঘুমিয়ে পড়েছে ভিখিরি আর সর্বহারার দল।

নিউসিনেমার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় কাল্লু। দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ভেবেছিল জরিনা, কাছে গিয়ে ভুল ভাঙে, না জরিনা নয়। এ সেই মেয়েটা যার কাজলটানা চোখে কালি পড়ছে দিন দিন একটু একটু ক'রে।

কাল্লুকে চিনতে পেরে মাথা নিচু করে মেয়েটা। হ্যাঁ ফিটনটাও একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে অন্য দিনের মত। অন্য দিনের মত হ'লেও আজ আর মন নেই কাল্লুর। কোনো কথা না বলে সোজা এগিয়ে যায় কাল্লু।

জব্বার মিয়া তখনো বসে আছে দোকানে কাল্লুর অপেক্ষায়। আশ্চর্য হয় কাল্লু জব্বার মিয়াকে দেখে। সালাম করার কথাটাও ভুলে যায় বেমালুম।

মিষ্টি গলায় কাছে ডাকে জব্বার মিয়া, ক্যারে কাঁহা গিয়াথা এতনা রাত।

বুড়ির মৃত্যুর সংবাদটা দেয় কাল্লু, পরমেশওরকি মা মর গই। ওঁহি গ্যায়থে চাচা।

বুড়িকে কোনোদিন চোখে দেখেনি জব্বার মিয়া, কিন্তু ওর অনেক কথাই শোনা আছে কাল্লুর মুখে। কাল্লুর জীবনের কোনো কথাতো আর লুকোনো নেই জব্বার মিয়ার কাছে। বুড়ো আক্ষেপ করে

দরদ ভরা কণ্ঠে, আহা বেচারী, তগদির বেটা,সব কুছ তগদিরকা বাত হ্যায়। খানা ওনা খায় ?

: নেই চাচা আজ ভুখ নেই হ্যায়, খানা নেই খায়েঙ্গে।

: নেই নেই এয়সা নেই করে, চল যা মু ধোলে।

সকাল বেলা কাল্লুকে গালাগালি করার পর থেকেই সমস্ত দিন আজ কাল্লুর কথা মনে পড়েছে জব্বার মিয়ার। তাই কাজের শেষে রাতের বেলায় বসে ছিল ওর অপেক্ষায়।

সত্তার ছিল কাল্লুব সমবয়সী।

খিদে নেই কাল্লুব তবুও জব্বার মিয়ার সাথে বসে ভাত খেতে হয়।

খেতে খেতে কথা বলে জব্বার মিয়া, আবতুলকো আজ জলদি ছুট্‌টি দে দিয়াথা ; উ সিনমা গিয়া হ্যায়।

খাওয়া বন্ধ হ'য়ে যায় কাল্লুর। অবাক হয়ে তাকায় জব্বার মিয়ার দিকে, ক্যা চাচা !

: হাঁরে দিন ভর খটেহে, দেখনে দে এক আধ দিন সিনেমা— একটুখানি জল বুঝি চিক্ চিক্ করছে জব্বার মিয়ার চোখের কোণে।

আর কোনো কথা বলেনা কাল্লু।

খাওয়া শেষ করে বিছানার পুঁটুলিটা নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে কাল্লু।

: চলেঁ চাচা, সালাম আলায়কুম্।

: ওয়ালায়কুম আস্ সালাম—ভগবানের আশীষ ঝরুক তোর ওপর।

এল্ মল্লিকের বারান্দার নিচে বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে কাল্লু।

সব কটা দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। আলো জ্বলছে না আর কোনো বাড়ীতে। শব্দ নেই দিনের হৈ হুল্লোড়ের।। ফাঁকা পথে

কেউ নেই কোথাও। রাত্রের ফিটন গাড়ী আর খদ্দের ধরা মেয়েরাও চলে গেছে অনেকক্ষণ আগে। বিজ্ঞাপনের রঙিন আলো আর ক্যাসেল পাখার আলোর ঘুর্ণি থেমে গেছে কখন কে জানে।

পথের দু'ধারের সারি সারি আলো আর আকাশের তারারা কুয়াসায় একাকার হয়ে কাঁপছে মিটিমিটি। দূর থেকে ট্রাম লাইনের কাজের শব্দ ভেসে আসছে টুং টাং ক'রে। শীতের দমকা বাতাসের বেগ থেকে থেকে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে শরীরের হাড়গুলো। একটা কুকুর গুটি গুটি এসে শুয়ে পড়ে কাল্লুর বিছানা ঘেঁষে। ঘুম নেই শুধু কাল্লুর চোখে। সমস্ত দিনের ঘটনা তোলপাড় করে মাথায়... পরমেশ্বরের মা মরে গেছে...কোন হতভাগী মা ফেলে গেছে তার নবাগত সন্তান পার্কের কোণে...জরিনা মা হতে চায়... আপনে বেটেঁকো হাম নহি মরনে দেঙ্গে...হাম মা হ্যায়।

ডুকরে কেঁদে ওঠে কাল্লু ছেঁড়া কাঁথায় মুখ গুঁজে—মা তুম কাঁহা হো!

মা ফিরে এসো।